গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬২ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ৯ - ১৫ এপ্রিল, ২০১০ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা

মহান নেতা
কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

"... পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার আর একটি মৌলিক 'ইন্‌জাস্টিস'-এর (অবিচারের) দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। দুশো-পাঁচশো বছর আগে, পুঁজিবাদ বিকাশের আগে মানুষের শ্রমশক্তির চরিত্র কী ছিল? লোকে পরিশ্রম করত নিজের ভোগের উদ্দেশ্যে উৎপাদন করার জন্য। আর খানিকটা বাড়তি উৎপাদন করত — তাও নিজের ভোগের উদ্দেশ্যেই বিনিময় করার জন্য। মানে সাধারণ মানুষের উৎপাদন শক্তির মালিকানা, শ্রমশক্তির মালিকানা তাদের নিজেদের হাতেই ছিল। আর আজ যারা খেটে খান — 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্‌' শ্রমিকই (বৌদ্ধিক শ্রমজীবী) হোন, অথবা যারা কায়িক শ্রম করেন তাঁরাই হোন, কৃষক-মজুরই হোন, আর প্রফেসরই হোন — তাঁদের শ্রমশক্তির মালিক তাঁরা নন। তাঁদের শ্রমশক্তি আজ পুঁজিবাদী বাজারের পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁদের শ্রমশক্তির মালিকানা আজ মালিকশ্রেণীর হাতে — মালিকরা কেনে-বেচে, শর্ত দেয়, সেই অনুযায়ী শ্রমিক শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। ফলে সাধারণ মানুষের শ্রমশক্তির চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে কী? না, তারা নিজের জন্য আর পরিশ্রম করে না। উৎপাদনের মধ্যে তাঁদের পরিশ্রম 'এমবডিড্‌' (মিশে) আছে। সেই অর্থে সাধারণ মানুষের শ্রমও আজ সামাজিক হয়ে গেছে। তার চরিত্র সামাজিক। মালিকরা যে উৎপাদন করে তা কি নিজে ভোগ করার জন্য করে? না, বাজারে বিক্রির জন্য করে। অর্থাৎ মালিকরা এ সমাজে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন করে। যদিও মালিকরা প্রকাশ্যে বলে, উৎপাদন হচ্ছে মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্য, অর্থাৎ সমাজের প্রয়োজনেই নাকি উৎপাদন। তাহলে উৎপাদনের চরিত্র আজকে আমাদের দেশে — জমির ফসলের ক্ষেত্রেই হোক্‌, আর শিল্প-কলকারখানার ক্ষেত্রেই হোক্‌ — হয়ে গেছে সামাজিক। উৎপাদনের চরিত্র হয়ে গেছে সামাজিক। তাই উৎপাদন যারা করেন সেই শ্রমশক্তির চরিত্রও হয়ে গেছে সামাজিক। অথচ উৎপাদনের মালিকানা রয়ে গেছে ব্যক্তিগত। এই যে উৎপাদন ও শ্রমশক্তির চরিত্র সামাজিক, আর মালিকানার চরিত্র ব্যক্তিগত — এই হ'ল এই সমাজের মূল অসামঞ্জস্য এবং সামাজিক অন্যায়-অবিচারের মূল বুনিয়াদ। আর এই যে 'প্রাইভেট রাইট অব এক্সপ্রোপ্রিয়েশন' (আত্মসাৎ করার ব্যক্তি অধিকার), অর্থাৎ সামাজিক শক্তি থেকে উদ্ভূত সম্পদকে ব্যক্তির আত্মসাৎ করার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার, সেই অধিকার রক্ষা করাই হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলার কাজ। তাই আমি বলি, আমাদের সমাজে যে আইন-শৃঙ্খলার কাঠামো তার মূল বুনিয়াদ হচ্ছে এই 'সোস্যাল ইন্‌জাস্টিস' (সামাজিক অবিচার)। অর্থাৎ আমাদের দেশে যে ন্যায়বিচারের ধারণার ওপর ভিত্তি করে আইন-শৃঙ্খলার কাঠামো প্রতিষ্ঠিত, তা মূলত এই সামাজিক অন্যায় ও অবিচারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। শ্রমের চরিত্র সামাজিক, শ্রমিক সমাজের জন্য কাজ করে, উৎপাদন সমাজের জন্য হচ্ছে; অথচ মালিকানা ব্যক্তিগত। আর সেই ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকারকে রক্ষা করার নাম হ'ল আমাদের দেশে আইন-শৃঙ্খলার বুনিয়াদী নীতি। এ কি ন্যায়বিচারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে? না, সামাজিক অন্যায় অবিচারের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ?

....আজ সমাজে যে আইন, ল অ্যান্ড অর্ডারের যে কাঠামো, তা

চারের পাতায় দেখুন

তেলের পুনরায় মূল্যবৃদ্ধির তীব্র সমালোচনা করল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

পেট্রোল-ডিজেলের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির তীব্র নিন্দা করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, দরিদ্র জনসাধারণের পরিত্রাতা সেজে ক্ষমতা দখলের পর ইউ পি এ সরকার উন্নত মানের জ্বালানি তেল ব্যবহার করে দূষণ নিয়ন্ত্রণের অজুহাতে পেট্রোল-ডিজেলের দ্বিতীয় দফা দাম বৃদ্ধি করল। এবারের দামবৃদ্ধির ফলে প্রতি লিটার পেট্রোল ও ডিজেলের দাম যথাক্রমে ৫০ পয়সা ও ২৬ পয়সা বেড়ে গেল। এর ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ইতিমধ্যেই আকাশছোঁয়া দাম আরও বাড়বে। সরকারি ফতোয়ায় এই মূল্যবৃদ্ধি জনসাধারণের উপর অমানবিক আক্রমণ। কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, ইউ পি এ সরকার যে নানা অজুহাতে মেহনতি জনগণের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনার সাথে সাথে ফুলে ফেঁপে ওঠা একচেটিয়া পুঁজিপতি ও কর্পোরেট হাউসগুলির জন্য বিপুল করছাড়, ঋণমকুবের ব্যবস্থা করতে এবং বাণিজ্যবৃদ্ধির জন্য ভরতুকির প্যাকেজ দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এই ঘটনা থেকেই তা স্পষ্ট।

সরকারের এই জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য কমরেড প্রভাস ঘোষ সাধারণ মানুষের প্রতি আহ্বান জানান।

১ এপ্রিল কলকাতার এসপ্ল্যানেডে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর বিক্ষোভ

সর্বনাশা 'শিক্ষা অধিকার আইনে'র কপি পোড়ালেন শিক্ষকরা

১ এপ্রিল কেন্দ্রীয় শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ কার্যকর করার দিনই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখান এবং আইনের কপি পোড়ান।

সমাবেশে সমিতির সাধারণ সম্পাদক কমরেড কার্তিক সাহা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার এই আইনে সকলের জন্য শিক্ষার কথা বললেও বাস্তবে এই আইনের মধ্য দিয়ে সর্বসাধারণের কাছ থেকে শিক্ষা কেড়ে নেওয়ার, শিক্ষার মান ধ্বংস করার চক্রান্তই করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সর্বপ্রথম প্রাথমিক স্তরে পাশ-ফেল প্রথা তুলে দিয়ে শিক্ষার যে সর্বনাশ করেছে, কেন্দ্রীয় সরকার তাকেই অনুসরণ করে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দিচ্ছে। ফলে কেন্দ্রীয় নীতির বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের প্রতিবাদ আসলে লোক দেখানো। শিক্ষার স্বার্থে উভয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা আইনের জনবিরোধী দিকগুলি হল — (১) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল থাকবে না, (২) যোগ্যতা নয়, বয়স অনুপাতে সংশ্লিষ্ট শ্রেণীতে ভর্তি নিতে হবে; (৩) ৬-১৪ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আঙিনায় আনার দায়িত্ব শিক্ষক-অভিভাবকদের, সরকারের নয়; (৪) শিক্ষকদের সপ্তাহে ৫ দিন ৮ ঘণ্টা ও শনিবার ৫ ঘণ্টা কাজ করতে হবে, শিক্ষাদান ছাড়া অন্য কাজও শিক্ষকদের করতে হবে; (৫) ১৫০ জনের কম ছাত্রছাত্রীসম্পন্ন স্কুলে প্রধান শিক্ষক থাকবে না।

২৪ এপ্রিল

এস ইউ সি আই (সি)
৬২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে
সমাবেশ

শহিদ মিনার ময়দান, বিকাল ৪টা

বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক

সভাপতি ঃ কমরেড মানিক মুখার্জী, পলিটব্যুরো সদস্য

পিটিটিআই ঃ ছাত্রছাত্রীদের প্রতারণা করেছে রাজ্য

২৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতে পিটিটিআইয়ের ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রি অবৈধ নয় বলে জানিয়েছে। এই রায় অনুযায়ী ৭৬,০০০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ৬০,০০০ ছাত্রছাত্রীরই ডিগ্রি বৈধ। অথচ রাজ্যে সম্প্রতি প্রায় যে ৩০,০০০ প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ করা হল, সেখানে এই ছাত্রছাত্রীদের ট্রেনিংয়ের জন্য প্রাপ্য ২২ নম্বর দেওয়া হয়নি। এনসিটিই রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়ে এই বৈধতার কথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়। কিন্তু রাজ্য সরকার তা গোপন করে যায়। এরই প্রতিবাদে ৩১ মার্চ রানি রাসমণি রোডে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ সমিতির সভাপতি আনন্দ হান্ডার নেতৃত্বে প্রায় পাঁচশ জন ছাত্রছাত্রী আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যপালের অফিসে ডেপুটেশনের কপি দেওয়া হয়। অফিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাঁদের পক্ষে যতদূর সম্ভব তাঁরা করবেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর কপি নিতেও অস্বীকার করে।

অত্যন্ত লজ্জার বিষয় হল, এতগুলি ছাত্রছাত্রীর এমন চূড়ান্ত ক্ষতির পরও রাজ্য সরকারের আইনজীবী ছাত্রছাত্রীদের ট্রেনিং-এর জন্য প্রাপ্য নম্বর দেওয়ার বিরোধিতা করছেন। রাজ্য সরকারের এই স্বৈরাচারী ভূমিকার বিরুদ্ধে চেয়ারম্যান এবং ডি আই স্তরে ঘেরাও কর্মসূচি চলবে বলে আনন্দ হান্ডা জানিয়েছেন।

অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের স্মরণে এ আই ডি ওয়াই ও

পার্ক স্ট্রিটের অগ্নিকাণ্ডে প্রশাসনের গাফিলতিতে নিহতদের স্মরণে এ আই ডি ওয়াই ও বেহালা পশ্চিমের হেমন্ত মুখার্জী রোড যুবকমিটি ও আদর্শনগর যুবকমিটির উদ্যোগে ২৬ মার্চ দুই জায়গায় স্মরণবেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানানো হয় ও এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। যাঁরা জীবন বিপন্ন করে এই অগ্নিকাণ্ডে আটকে পড়া অসহায় মানুষদের উদ্ধারকার্যে সাহায্য করেছেন, তাঁদের অভিনন্দন জানানো হয়।

স্থায়ীকরণের দাবিতে ব্যাঙ্ক শ্রমিকদের বিক্ষোভ

ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের ইউকো ব্যাঙ্ক শাখার ডাকে হেড অফিসের গেটে ১ এপ্রিল বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। সভায় পার্টটাইম কর্মীদের ফুলটাইম করা, ক্যাজুয়াল ক্যান্টিন কর্মী ও সুইপারদের এবং ঠিকা শ্রমিকদের স্থায়ী করার দাবিতে ইউনিয়নের সভাপতি কমরেড অরূপরতন সাহা ও সম্পাদক কমরেড আলোকতীর্থ মণ্ডল বক্তব্য রাখেন। একই দাবিতে ২৬ এপ্রিলও বিক্ষোভ দেখানো হবে বলে ফোরামের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

বীরভূমে আলুচাষিদের জাতীয় সড়ক অবরোধ

গত মরসুমে আলুচাষিরা দেড় থেকে দু'টাকা কেজি দরে অভাবি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। সেই আলু জনসাধারণ ব্যবসায়ীদের থেকে কিনতে বাধ্য হয়েছিল ২০-২২ টাকা কেজি দরে। চড়া হারে মুনাফা লুটেছিল ফাটকাবাজ ব্যবসায়ীরা। এ বছর সরকার চাষিদের কাছ থেকে ৩.৫০ টাকা কেজি দরে কিছু পরিমাণ আলু কেনার কথা ঘোষণা করলেও তা কেনার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেনি। অভাবের তাড়নায় অসহায় চাষিরা মাত্র ১ টাকা থেকে দেড় টাকা কেজি দরে ব্যবসায়ীদের কাছে আলু বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। অথচ সরকার নিয়োজিত সংস্থাগুলি চাষিদের কাছ থেকে না কিনে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকেই সাড়ে তিন টাকা দরে কিনে কাগজে কলমে সরকারি হিসাব ঠিক রাখছে।

এই প্রতারণা ও জুয়াচুরির বিরুদ্ধে প্রশাসনকে জানিয়ে কোনও ফল না পেয়ে আলুচাষি সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে কয়েক শত চাষি নলহাটিতে ৬৩ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। কমিটির সম্পাদক নীলাম্বর চট্টরাজ, এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর আব্দুস সালাম, উজ্জ্বল সেখের উপস্থিতিতে কয়েক ঘণ্টা অবরোধের পর প্রথমে নলহাটি থানার পুলিশ, পরে বি ডি ও এসে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তি এবং সরকারি দামে আলু কেনার প্রতিশ্রুতি দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

হরিয়ানার রোহটকে ১৫ মার্চ নির্মাণ শ্রমিকদের সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সত্যবান

কর্নাটকে রেলের ঠিকা শ্রমিকদের প্রথম কনভেনশন

রেলের চাকা সচল রাখা সহ নানা কাজে যাদের শ্রমের মূল্য অপরিসীম সেই ঠিকা শ্রমিকরা ন্যূনতম বেতন থেকে বঞ্চিত। প্রশাসন মিনিমাম ওয়েজ অ্যাক্টের তোয়াক্কা করে না। ফলে ঠিকাদার ও রেলওয়ে প্রশাসনের মিলিত চক্রে ঠিকা শ্রমিকদের শোষণ, বঞ্চনা, অবহেলা বেড়েই চলেছে। এর বিরুদ্ধে ২০ জানুয়ারি কর্ণাটকের হুবলিতে অনুষ্ঠিত হল সংযুক্ত ঠিকা শ্রমিক ইউনিয়নের (দক্ষিণ পশ্চিম রেলওয়ে) প্রথম কনভেনশন।

মহিশূর, ব্যাঙ্গালোর ও হুবলি ডিভিশনের শ্রমিকদের এই কনভেনশনে এ আই ইউ টি ইউ সি-র বিশিষ্ট নেতা কমরেড সুনীল মুখার্জী বলেন, বিশ্বায়ন, বেসরকারিকরণ, উদারিকরণের ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারাচ্ছেন। ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশে একদিকে বেতন বৈষম্য বেড়েছে, অন্যদিকে গ্রুপ ডি পদের অবলুপ্তি ঘটিয়ে ঠিকা শ্রমিকদের দিয়ে স্থায়ী শ্রমিকের কাজ করানো হচ্ছে। অথচ তাদের ন্যূনতম বেতনও দেওয়া হচ্ছে না। ঠিকা শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। তিনি আরও বলেন, যে পুঁজিবাদী শোষণমূলক ব্যবস্থার জন্য শ্রমিকশ্রেণী আজ শোষিত বঞ্চিত, সেই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা বিপ্লবী সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে হবে।

প্রধান বক্তা সংগঠনের সভাপতি এ আই ইউ টি ইউ সি-র কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে সোমশেখর বলেন, ঠিকা শ্রমিকরা নিয়মিত নির্দিষ্ট দিনে বেতন, চিকিৎসা ও পিএফ-এর সুবিধা পাচ্ছেন না, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। ঠিকা শ্রমিকরা সুসজ্জিত মিছিল করে রেলের জেনারেল ম্যানেজারের নিকট দাবিপত্র পেশ করে।

সরকারি কর্মচারীদের নতুন সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তুতি

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলনকে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যোগ্য নেতৃত্ব — যা অবশ্যই সুবিধাবাদ, অর্থনীতিবাদ, কানুনি বেড়াজাল, সংস্কারবাদ থেকে মুক্ত উন্নত আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হবে। এই উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের নতুন সংগঠন গড়ার জন্য 'ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়) '৯১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট স্টাগলিং এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের উদ্যোগে ১ ও ২ মে সুবর্ণবণিক সমাজ হলে 'ঐক্যসম্মেলন' অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আন্দোলনের দুই প্রবীণ নেতা সাধন রায় এবং ফটিক দে ১৯ ফেব্রুয়ারি মহাকরণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ''১৯৭৭ থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি নেতৃত্ব সরকারকে বন্ধু বলে কর্মচারী আন্দোলনকে বিসর্জন দিয়ে শাসকশ্রেণীর কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে।'' তাঁরা আরও বলেন, যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের ডাকে সরকারি কর্মচারীদের ২২ জানুয়ারি ২০০৯-এর ধর্মঘট ১৮ নভেম্বর '০৮ ঘোষণার দিন থেকে ধর্মঘটের দিন পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়) প্রবল বিরোধিতা করেছিল। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিও ধর্মঘটের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। এই দুই শক্তির বিরোধিতা সত্ত্বেও কর্মচারীরা আবেগের সাথে ধর্মঘট সফল করেছিলেন। ধর্মঘট ভাঙতে নবপর্যায়ের নেতারা ধর্মঘটী কর্মচারী সদস্য, নেতা ও সংগঠকদের শো-কজ করে। এমনকী নবপর্যায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফটিক দে-কে বহিষ্কার করে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য কনভেনশনের মধ্য দিয়ে ইউনিটি ফোরাম গড়ে ওঠে।

ইতিমধ্যে জেলায় জেলায় 'ঐক্য প্রস্তুতি কমিটি' গঠনের কাজ শুরু হয়েছে। ১২ মার্চ নবপর্যায় '৯১-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সভায় চিন্তামণি সাহুকে সভাপতি ও শুভাশীষ দাসকে সম্পাদক নির্বাচিত করে অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে 'ঐক্য সম্মেলনের' জোর প্রস্তুতি চলছে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

বিদ্যুৎ মাশুল কমানোর দাবিতে কমিশনে স্মারকলিপি

মাশুলবৃদ্ধি ও লোডশেডিং বন্ধের দাবিতে ২৯ মার্চ অ্যাবেকার সভাপতি সঞ্জিত বিশ্বাসের নেতৃত্বে পাঁচজনের এক প্রতিনিধিদল রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের চেয়ারম্যানের হাতে স্মারকলিপি দেন। স্মারকলিপিতে বলা হয়, শোনা যাচ্ছে পুনরায় এফপিপিসিএ অর্থাৎ কয়লার খরচের জন্য মাশুল বৃদ্ধি করা হবে। এর প্রতিবাদে অ্যাবেকা বলে, বাইরে থেকে বেশি দামে কয়লা না কিনে ক্যাপটিভ কয়লা খনির কয়লা দিয়ে উৎপাদন করলে ও রিজনেবল রিটার্ন ১৪ শতাংশের পরিবর্তে ব্যাঙ্ক রেটে করলে মাশুলবৃদ্ধি বন্ধ হবে, এমনকী বিদ্যুৎ মাশুল কমে যেতে বাধ্য।

অ্যাবেকা মনে করে, বিদ্যুতের মাশুল ছাড়া এফপিপিসিএ, ফিক্সড চার্জ ইত্যাদি গ্রাহকরা দিতে বাধ্য নয়। এইসব বেআইনি চার্জ বাতিল করতে হবে। অ্যাবেকা নেতৃত্ব কমিশনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি রাজ্যের কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পে চরম সংকট সৃষ্টি করবে। তাই পুনরায় মাশুলবৃদ্ধি করা হলে রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে কমিশন দপ্তর টানা ৭ দিন ঘেরাও করে রাখা হবে।

কমিশনের চেয়ারম্যান বলেন, এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে মাশুল বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার ইচ্ছা করলে ভর্তুকি দিয়ে মাশুল কমাতে পারে। গত বছর যে ১২৫ কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়েছিল তা মার্চ মাসে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফলে এপ্রিলের বিল, যা গ্রাহকদের মে মাসে দিতে হবে, তাতে সরকারি ভর্তুকি শেষ হয়ে যাওয়ায় এমনিতেই সিইএসসিতে ইউনিট প্রতি ১৮ পয়সা এবং বন্টন কোম্পানিতে ১৪ পয়সা মাশুল বেড়ে যাচ্ছে।

এসসি-এসটি ওয়েলফেয়ার অফিসারের নিকট ডেপুটেশন

তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের বুকগ্র্যান্ট ও স্টাইপেন্ড সঠিক সময়ে দেওয়া, সাঁতুড়িয়া ব্লকে তালবেড়িয়া পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয়ের হোস্টেল নির্মাণ, হোস্টেলগুলিতে উপযুক্ত পরিকাঠামো এবং পুরুলিয়া শহরের কেন্দ্রীয় ছাত্রীনিবাসে ও হোস্টেলগুলিতে জলের ব্যবস্থা করা সহ বিভিন্ন দাবিতে এসসি-এসটি স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটির উদ্যোগে পুরুলিয়া এসসি-এসটি ওয়েলফেয়ার অফিসারের নিকট ২৬ মার্চ ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন যুগ্মসম্পাদক নলিনী বাউরী, বারিক সিং মুড়া, সভাপতি কালিপদ মুর্মু, সাবিত্রী মাহাত, বিজয় সিং মুড়া। অফিসার দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ছাত্রীনিবাসে দ্রুত জলের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

সুপ্রিম কোর্টের রিপোর্ট

ভারতের ৮০ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে

অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জীর নেতৃত্বে এমপাওয়ার্ড গ্রুপ অফ মিনিস্টারস (ই জি ও এম) 'ফুড সিকিউরিটি বিল ২০১০' (খাদ্য নিরাপত্তা বিল)-কে ছাড়পত্র দিয়েছে। প্রতিটি গরিব পরিবারকে মাসে প্ল্যানিং কমিশনের ঠিক করে দেওয়া সিলিং মেনে ৩ টাকা কেজি দরে ২৫ কেজি চাল ও গম দেওয়া হবে বলে বিলটিকে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুধা ও অপুষ্টির মোকাবিলায় স্বাধীন ভারতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সাহসী পদক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এর আগে জনস্বার্থে করা একটি মামলাকে ঘিরে সুপ্রিম কোর্ট যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে সেটি দেশের গরিব মানুষের অনাহার ও অপুষ্টি দূরীকরণে কেন্দ্রীয় সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা সম্পর্কেই কার্যত প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের পূর্বতন বিচারপতি ডি পি ওয়াধার নেতৃত্বে দেশ জুড়ে পর্যালোচনার পর তৈরি করা রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা যা দেখাচ্ছে, বাস্তবে গরিবের সংখ্যা তার থেকে অনেক অনেকগুণ বেশি। এর আগেও বিভিন্ন কমিটি ও কমিশন তাদের রিপোর্টে দেখিয়েছে, সরকারের দেখানো হিসাবের চেয়ে দেশে দারিদ্র অনেক বেশি। সাধারণ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতাও তাই। ওয়াধা রিপোর্টে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, দেশে দারিদ্রসীমার নিচে থাকা পরিবারের সংখ্যা ২০ কোটি। অন্তত ৪ জন করে ধরলে ২০ কোটি পরিবারে দারিদ্রসীমার নিচে মানুষের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০ কোটি। এদের জন্য মাসে ২৫ কেজি নয়, ৩৫ কেজি করে ভরতুকির খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে বলা হয়েছে (হিন্দুস্তান টাইমস, ২৪.০৩.১০)।

১১০ কোটি মানুষের দেশে ৮০ কোটি মানুষ গরিবিসীমার নিচে অনাহারে অপুষ্টিতে দিনযাপন করে। কী মর্মান্তিক পরিস্থিতি দেশের! অথচ, রেডিও, টিভি ও সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার জোরদার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যে, দেশে নাকি উন্নয়নের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। বেশ গর্বভরে প্রচার করা হচ্ছে, বিশ্বের সবচেয়ে সম্পদশালী ১০ জনের মধ্যে ভারতেরই দু-জন। বলা হচ্ছে, দেশে কোটিপতির সংখ্যা বাড়ছে। শহরাঞ্চলে মোটর গাড়ি চলার মসৃণ চকচকে রাস্তা, চোখ ধাঁধানো শপিং মল, আকাশছোঁয়া আবাসন দেশের উপচে পড়া প্রাচুর্যের নিদর্শন বহন করছে। হাতে হাতে মোবাইল ফোন, জিন্সের পোশাক, মোটরবাইকে ছুটন্ত মানুষ, ট্রেনে-বাসে কম্পিউটার বোদ্ধা তরুণ-তরুণীদের ডায়ালগ, চতুর্দিকে গজিয়ে ওঠা বিউটিপার্লারে নারী-পুরুষের ভিড় — সর্বত্রই নাকি আর্থিক উন্নয়নের ছাপ। দেশের দারিদ্র নাকি ভয়ে মুখ লুকোচ্ছে। প্রচার করা হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা, ইন্দিরা আবাস যোজনা, বছরে ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি স্কিম ইত্যাদি নানা প্রকল্পের সাহায্যে সমাজের দারিদ্রসীমার নিচের মানুষদের উপরে টেনে তোলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং গত ২৭ ডিসেম্বর ওড়িশার ভুবনেশ্বরে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বেশ জোর দিয়েই বলেছেন, 'দেশে দারিদ্র নিশ্চয়ই কমছে'। তারও আগে থেকে কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং কমিশন একেবারে পরিসংখ্যান সহযোগে বলে চলেছে, ১৯৭৭-৭৮ সালে দেশে দারিদ্রসীমার নিচে ছিল ৫১.৩ শতাংশ মানুষ, ১৯৯৩-৯৪-তে কমে হয়েছিল ৩৬ শতাংশ, তারপর ২০০৪-০৫-এ আরও কমে দাঁড়িয়েছে ২৭.৫ শতাংশ। ৫ বছর কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় থাকা বিজেপি সরকারের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী যশোবন্ত সিনহাও বলেছিলেন, 'ভারতে দারিদ্র উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।'

দারিদ্রসীমা নির্ধারণের মাপকাঠির চালাকি

দেশের দারিদ্রসীমা নির্ধারণে ১৯৭০-এর দশকে তৎকালীন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার পুষ্টির নিরিখে মাপকাঠি স্থির করেছিল যে, মাথাপিছু শহরাঞ্চলে গড়ে ২১০০ ক্যালরি এবং গ্রামাঞ্চলে গড়ে ২৪০০ ক্যালরি সম্পন্ন খাদ্য কেনার ক্ষমতা যাদের নেই, তারাই দারিদ্রসীমার নিচে থাকা গরিব মানুষ। কারণ, ওই পরিমাণ ক্যালরি মানব শরীরে পুষ্টির জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন। ১৯৭৩-৭৪ সালে ২৮তম জাতীয় নমুনা সমীক্ষার (এন এস এস) তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ওই সময় খাদ্যদ্রব্যের যা মূল্যমান ছিল, সেই অনুযায়ী ওই পরিমাণ ক্যালরিযুক্ত খাদ্য কিনতে মাথাপিছু গড় ব্যয়ের পরিমাণ শহরাঞ্চলে মাসিক ৫৬ টাকা ৬৪ পয়সা এবং গ্রামাঞ্চলে ৪৯ টাকা ০৯ পয়সা। সরকারি হিসাবে যাদের এই ব্যয়ের ক্ষমতা নেই, তারা গরিব। এরপর জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। সেই দামে ন্যূনতম পুষ্টির নিরিখে এবং ২০০৪-০৫ সালে ৫৩৮ টাকা ৬০ পয়সা (প্রতিদিন ব্যয়ের ক্ষমতা ১৭ টাকা ৯৫ পয়সা) ও ৩৫৬ টাকা ৩০ পয়সা (প্রতিদিন ব্যয়ের ক্ষমতা ১১ টাকা ৮৭ পয়সা) ব্যয়ের ক্ষমতা না থাকলে সরকারি হিসাবে তাদের দারিদ্রসীমার নিচে বিবেচনা করা হয়েছে। ২০০৪-০৫ সাল এবং তারপর বাজারদর যা, তাতে শহরে দৈনিক ১৮ টাকা ও গ্রামে দৈনিক ১২ টাকা ব্যয়ের ক্ষমতা নিয়ে বাঁচা দূরে থাক, টিকে থাকাই যে অসম্ভব, তা বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না। তবু, এইভাবে হিসাব করে কেন্দ্রীয় সরকারের যোজনা কমিশনের পক্ষে দেখানো সুবিধাজনক হয়েছে যে, দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমছে।

ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি'র ২৮ জুলাই - ৩ আগস্ট, ২০০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ১৯৯৯-২০০০ সালের ৫৫তম দফার তথ্য আমরা ইতিপূর্বে গণদাবী'র (২১ মে - ৪ জুন, ২০০৯) পাতায় তুলে ধরেছি। সেখানে দেখানো হয়েছে, হিসাবের কারচুপি করে ভারতের যোজনা কমিশন শুধু যে দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার থেকে কমিয়ে দেখাচ্ছে তাই নয়, গরিবের সংখ্যা খাতা-কলমে কমানোর জন্য মাথাপিছু প্রয়োজনীয় পুষ্টির পরিমাণও কম করে ধরেছে। অথচ, এই ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পুষ্টির মাত্রা নির্ধারণ করেছিল সরকারের যোজনা কমিশনই।

সরকারি হিসাবে দেখানো হয়েছে, ২০০৪-০৫ সালে দেশে মোট জনসংখ্যার ২৭.৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে ছিল এবং গ্রামাঞ্চলে এই হার ছিল ২৮.৩ শতাংশ। অথচ, কেন্দ্রীয় সরকারের প্ল্যানিং কমিশন নিযুক্ত অর্থনীতিবিদ সুরেশ তেন্ডুলকরের নেতৃত্বাধীন এক বিশেষজ্ঞ কমিটি তাদের পেশ করা সমীক্ষা-রিপোর্টে দেখিয়েছে, ২০০৪-০৫ সালের হিসাবে দেশে দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষের হার ৩৭ শতাংশ এবং গ্রামীণ এলাকায় এই হার ৪২ শতাংশ।

২০০৯-এর জুন মাসে কেন্দ্রীয় গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক নিয়োজিত এন সি সাক্সেনা কমিটি এক সমীক্ষায় দেখিয়েছে, দেশের ৪৯.১ শতাংশ, অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক মানুষই দারিদ্রসীমার নিচে চলে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, সাক্সেনা কমিটিকে এই হিসেব কে প্রকাশ করতে বলেছে? তাদের তো শুধু দারিদ্রসীমা নির্ধারণের মাপকাঠি ঠিক করতে বলা হয়েছিল।

অর্থনীতিবিদ অর্জুন সেনগুপ্তর নেতৃত্বাধীন 'ন্যাশনাল কমিশন ফর এন্টারপ্রাইজেস ইন দ্য আনঅর্গানাইজড সেক্টর' দেখিয়েছিল, দেশের ৭৭ শতাংশ মানুষ 'শোচনীয় দারিদ্রে'র কবলে। এদের দৈনিক আয় ২০ টাকারও কম। আবার, এদের একটা বড় অংশের দৈনিক আয় ৯ টাকারও নিচে।

এবার সুপ্রিম কোর্ট নিয়োজিত বিচারপতি ওয়াধা-র রিপোর্ট দেখাল, সরকারের দারিদ্রসীমা নির্ধারণের মাপকাঠি চরম অবাস্তব। মাথাপিছু দৈনিক গ্রামে ১২ টাকা ও শহরে ১৮ টাকায় মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকাই সম্ভব নয়। দৈনিক ১০০ টাকার কম আয় যাদের, তাদেরই দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষ বলে সুপ্রিম কোর্টের ওয়াধা রিপোর্টে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই হিসেবে দেশে দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা ৮০ কোটি।

৯০-এর দশক থেকে দারিদ্রবৃদ্ধি আরও লাগামছাড়া

স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, তারই অনিবার্য নিয়মে দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে কুক্ষিগত হচ্ছে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ শোষিত হচ্ছে, দারিদ্র বাড়ছে। কিন্তু ১৯৯০-এর দশকের প্রথম দিকে দেশে আর্থিক সংস্কারের নামে উদার আর্থিক নীতির প্রচলন যখন শুরু হল, তখন থেকেই সাধারণ মানুষের জন্য যতটুকু রাষ্ট্রীয় রক্ষাকবচের ব্যবস্থা ছিল, সেটাও সরকার সরিয়ে নিতে লাগল। শোষণ-লুণ্ঠন ক্রমাগত লাগামছাড়া করতে লাগল। তার ফলে আরও দ্রুত হারে বাড়ছে আর্থিক বৈষম্য, আয়ের বৈষম্য এবং ওই দশকেই এ দেশে অনাহার পৌঁছেছে সর্বোচ্চ স্তরে। ৯০-এর দশকের মাঝামাঝি নতুন করে দেশের তিন কোটি মানুষ চলে গেছে অনাহারের তালিকায়। এখন অনাহারের বিশ্ব তালিকায় ১১৯টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ৯৪তম।

সরকারের কর্মসংস্থান বহুদিন বন্ধ

কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ বহুদিনই খুব কম। গ্রামাঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থান নেই। অকৃষিক্ষেত্রেও কর্মসংস্থান তথৈবচ। বছরে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প নিয়েও চলছে চূড়ান্ত দুর্নীতি। সরকারি ঘোষণায় বছরে ১০০ দিনের কাজের কথা থাকলেও অধিকাংশ রাজ্যে গড়ে ২০ দিনের কাজও মিলছে না। সরকারি তথ্যই বলছে, দেশে গত তিন বছরে কাজ পাওয়ার বার্ষিক গড় মাত্র ৪৫ দিন। বছরে ৩৬৫ দিনের অবশিষ্ট ৩২০ দিন গরিব মানুষ কেমন করে টিকে বেঁচে আছে, কে তার খবর রাখে? গ্রামীণ পরিবারগুলির ৮৫ শতাংশেরও বেশি মানুষ হয় ভূমিহীন, আধা-প্রান্তিক, প্রান্তিক, নয়তো ক্ষুদ্র চাষি। ৯০-এর দশক থেকে এ পর্যন্ত এই মর্মান্তিক পরিস্থিতিকে ভাল করার কোনও উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেনি। বরং পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলতে বহু কিছুই করা হয়েছে। গ্রামীণ ক্ষুদ্র চাষিদেরও জীবনধারণ অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কোটি কোটি মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে ছুটছে কাজের সন্ধানে, যদি কিছু উপার্জন করে পরিবারকে বাঁচানো যায়। কিন্তু শহরেও কাজ কোথায়! সেখানেও কাজ হারাচ্ছে মানুষ। লক্ষ লক্ষ কল-কারখানা বন্ধ, কোটি কোটি শ্রমিক কর্মহারা। অনাহারে-অসুস্থতায় ভুগছে, অনেকে ইতিমধ্যেই আত্মহত্যা করেছেন, কেউ কেউ আবার সপরিবারে। বিভিন্ন বেসরকারি অফিসে যাঁরা কাজ করছেন, তাঁদেরও অধিকাংশকে ১০-১২, এমনকী ১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত খাটানো হচ্ছে। বেতন সেই তুলনায় সামান্যই। মানুষ যাবে কোথায়? ছুটছে রাজ্যের বাইরে, দেশের বাইরে — আরব, আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়ায়। তারা বহুক্ষেত্রেই পড়ছে ঠগবাজদের কব্জায়। অধিকাংশকেই বিদেশে ক্রীতদাসের মতো খাটানো হচ্ছে। মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে তার কিছু মর্মান্তিক কাহিনী প্রকাশ হয়ে পড়ে। এখন তো বিশ্বব্যাপী মন্দার প্রকোপে বিদেশের কাজও চলে যাচ্ছে। তারা দলে দলে ফিরে আসছে দেশে, দরিদ্র পরিবারের ক্ষুধার্ত মানুষদের হাহাকারের মধ্যে।

অনাহার-অপুষ্টিতে ভারত এখন বিশ্বসেরা

ক্রমবর্ধমান দারিদ্রের কারণে অনাহার। অনাহার থেকে বাড়ছে অপুষ্টি। অপুষ্টির শিকার হওয়া বিশ্বের সবচেয়ে বেশি মানুষের বাস এদেশেই। বিশ্বের প্রতি তিনজন অপুষ্ট শিশুর মধ্যে একজন থাকে ভারতে। ২০০৮-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ দেশের ৪২.৫ শতাংশ শিশু অপুষ্টিতে ভুগছে।

দেশের ২৩ কোটি মানুষ অপুষ্টির শিকার। দেশে যত শিশু মারা যায় তার ৫০ শতাংশই অপুষ্টির কারণে। ৫ বছরের কমবয়সী ৭০ শতাংশেরও বেশি শিশু রক্তাল্পতায় ভুগছে। (সূত্র ঃ দ্য টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ২৭-০২-০৯)।

প্রধানমন্ত্রী বলুন, কাদের অপরাধে জাতির এই লজ্জা

প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের প্রধান হিসাবে মালিকশ্রেণীর লাগামছাড়া শোষণ-লুণ্ঠন রথের সারথীর কাজ করছেন। আবার, এই শোষণ-লুণ্ঠনের অনিবার্য পরিণতিতে নেমে আসা দেশজোড়া অপুষ্টির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনিই বলছেন, এ হল 'জাতীয় লজ্জার বিষয়'। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলুন, কাদের অপরাধে জাতির এই লজ্জা? কাদের শাসনের কল্যাণে (?) কোটি কোটি 'ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিঙাড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস' দেশে কোটিপতির সংখ্যা বাড়ে? ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতালাভের পর থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ৬২ বছরের মধ্যে ৫ বছরের জন্য বিজেপি সরকার এবং আর প্রায় ৫ বছরের অন্যান্যদের মিলিজুলি সরকার। অবশিষ্ট ৫২টি বছর তো তাঁদেরই কংগ্রেস সরকার দেশের কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় আসীন। তাহলে জাতির এই লজ্জার দায় তো প্রধানত তাঁদেরই নিতে হবে। তাঁরাই তো এই অপুষ্ট, অনাহারী, দারিদ্রন্যুব্জ ভারতের স্রষ্টা। তাঁর সরকার বলছে, ব্যাপক উন্নয়নের ফলে নাকি দারিদ্র দ্রুত কমছে। তাই যদি হয়, তবে 'জাতির লজ্জা' এই অপুষ্টি কেন? দারিদ্র কমলে কি অপুষ্টি বাড়ে? প্রধানমন্ত্রী কথিত এই 'জাতি' আসলে সমগ্র জনসাধারণ নয়। শোষক-শোষিতে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ওদের 'জাতি' হচ্ছে পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের পারিষদবর্গ।

দেশে ভয়াবহ অপুষ্টির জন্য তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ যদি এতটুকু আন্তরিক হত, তাহলে তাঁর সরকার এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেও খাদ্যপণ্যের বেআইনি মজুতদারি, ফাটকাবাজি মূল্যবৃদ্ধি রুখতে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করত। কৃষকদের ফসলের ন্যায্য বাজারদর সুনিশ্চিত করত। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) বহু আগে থেকেই পাইকারি ও খুচরা উভয় স্তরে খাদ্যদ্রব্যে ব্যক্তিগত ব্যবসা নিষিদ্ধ করার যে অত্যন্ত জরুরি দাবিটি জানিয়ে আসছে, তা তারা কার্যকর করত। সরকার সরাসরি উৎপাদকদের থেকে খাদ্যপণ্য ন্যায্য দামে কিনত এবং সেগুলি সারা দেশে বা রাজ্যগুলিতে একটা নির্দিষ্ট দামে বিক্রি করত। খাদ্যদ্রব্যে ব্যক্তিগত ব্যবসা নিষিদ্ধ করায় বেকার হয়ে যাওয়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স দিয়ে সরকার নির্ধারিত দামে বিক্রির দায়িত্ব দিতে পারত। মাঝখানে কোনও ফড়ে বা দালালচক্র অপকর্ম করার সুযোগ পেত না। কিন্তু এ সংক্রান্ত কোনও উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেনি। করবে কী করে? মনমোহনজীর কংগ্রেস সরকারই অত্যাবশ্যক পণ্য আইনকে দুর্বল করেছে; ধান, চাল, গম, মোটাদানার শস্য, চিনি তৈলবীজ, তেল ইত্যাদি ১২টি পণ্যকে অত্যাবশ্যকপণ্যের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে এবং এগুলির ব্যবসায় লাইসেন্স নেওয়া, মজুত করা ও পণ্য চলাচলে নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়ার কাজ করেছে। জনগণের পক্ষে যে সব পণ্য অত্যাবশ্যক, সেগুলিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে বৃহৎ ব্যবসাদারদের লুঠের ছাড়পত্র দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্ট গ্রহণ করলে আইনে পরিণত হতে পারে বলে অভিজ্ঞমহল মনে করছেন। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটা হল, এ বিষয়ে গত ৯ বছরে সুপ্রিম কোর্ট ৫০টিরও বেশি অর্ডার পাশ করেছিল। সেগুলি কি সরকার মান্যতা দিয়েছিল? অথচ ধর্মঘটকে বেআইনি বলে ঘোষিত কোর্টের আদেশ লাগু করতে সরকারগুলি ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

বোটানিক্যাল গার্ডেনকে প্রমোদ উদ্যানে পরিণত করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন এলাকার মানুষ

গত ২৪ জানুয়ারি স্থানীয় প্রোমোটার ও প্রভাবশালী সিপিএম নেতা বাবু বাগচির বিয়ে উপলক্ষে প্রীতিভোজের আসর বসেছিল দু'শো বছরেরও বেশি প্রাচীন ঐতিহাসিক বোটানিক্যাল গার্ডেনে। বনদপ্তর ও গার্ডেনের সমস্ত নিয়মকানুনকে পদদলিত করে গার্ডেনের সবুজকে ধ্বংস করে অস্থায়ী উনুনে রান্না করা হয়েছে। মদের খালি বোতল ও প্লাস্টিকের থালা, গ্লাস যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরিবেশ দূষিত করা হয়েছে। ৩৩ বছরের সিপিএম ফ্রন্টের শাসনে দলের তকমা আঁটা থাকলে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানো কত সহজ, এ ঘটনায় তা আবার প্রমাণিত হল। সংবাদে প্রকাশ, এই বিয়ের ভোজে উপস্থিত ছিলেন শাসকদলের দু'জন প্রাক্তন ও একজন বর্তমান বিধায়ক, স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি সহ প্রায় ১২০০ জন। ঘটনাটি প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর বিড়ম্বিত বোটানিক্যাল গার্ডেন কর্তৃপক্ষ একে যতই তাঁদের অজ্ঞাতে ঘটে যাওয়া একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলুন না কেন, স্থানীয় মানুষের স্পষ্ট বক্তব্য, এটা শাসকদল ও রাজ্য-প্রশাসনের মদতে উদ্ভিদ গবেষণার কেন্দ্র হিসাবে বিশ্বজুড়ে খ্যাত বি-গার্ডেনকে ধীরে ধীরে প্রমোদ-কাননে পরিণত করার অপচেষ্টার অনিবার্য পরিণতি।

উদ্ভিদ গবেষণার কেন্দ্র হিসাবে বি-গার্ডেনের খ্যাতি বিশ্বজোড়া

১৭৮৭ সালে হাওড়ার শিবপুরে ২৭৩ একর জমিতে ইন্ডিয়ান বোটানিক্যাল গার্ডেনের পত্তন করেছিলেন কর্ণেল কীড সাহেব। এই গার্ডেনটি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম গার্ডেন। শুরুতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই গার্ডেন প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, বাণিজ্যিক মূল্য আছে এমন সব গাছ সংগ্রহ করা, সুগন্ধি মশলার চাষ করে বাণিজ্যের কাজে লাগানো। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত উদ্ভিদবিদ উইলিয়াম রকস্‌বার্গ সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে নিযুক্ত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করে একটি সমৃদ্ধ সংরক্ষণ কেন্দ্র গঠন করেন। নানা ধরনের উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণার প্রাণকেন্দ্র হিসাবে এই গার্ডেনটি গড়ে তোলা হয়েছিল। সেজন্য দেশ-বিদেশের ছাত্রছাত্রী গবেষক ও বিজ্ঞানীরা এখানে ছুটে আসেন। এখানে পাট, চা, রবার, সিঙ্কোনা, মেহগনি, সেগুন ইত্যাদি অসংখ্য উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণার খ্যাতি বিশ্বজোড়া। সমগ্র এশিয়ার মধ্যে একসময় এটি ছিল উদ্ভিদ বিজ্ঞানচর্চার একমাত্র কেন্দ্রস্থল। ২৬টি ডিভিশনে বিভক্ত গার্ডেনটিতে অসংখ্য ট্রপিকাল, সাব-ট্রপিকাল গাছপালা আছে। দুই শতাব্দী প্রাচীন এই গার্ডেনে সর্বাধিক আকর্ষণীয় বটগাছ একহাজার ফুট পরিধি নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে, যদিও মূলকাণ্ডটি ছত্রাক আক্রমণের কারণে ১৯২৫ সালে সরিয়ে ফেলা হয়।

রক্সবার্গ সাহেব ও তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরীরা এমন সুন্দর পরিকল্পনা করে গাছ লাগিয়েছিলেন, যাতে ঝড়ে বাগানটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। কারণ তাঁরা জানতেন, এখানে ভূগর্ভ জলস্তর অগভীর, ফলে শেকড় মাটির বেশি নিচে প্রবেশ করবে না। তাই গোড়ায় ঢিপি করে মাটি দিতে হয়েছে গাছগুলোকে বিশেষভাবে রক্ষা করার জন্য।

অযত্নে অবহেলায় বহু মূল্যবান গাছের বিলুপ্তি

বিশ্বায়নের যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার চেয়েও

বোটানিক্যাল গার্ডেনে পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত ও ডেইলি ওয়াকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক তাপস দাস (ডান দিকে) সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

বড় হয়ে দেখা দিয়েছে বাণিজ্যিক স্বার্থ। শুরুতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যিক স্বার্থে এই উদ্যানটি তৈরি করলেও পরবর্তীকালে এটি বিশ্বের উদ্ভিদ বিজ্ঞানচর্চার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়। বর্তমানে সেটিকে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালনার চেষ্টা হচ্ছে। রাজস্ব আদায়ের সাথে চালু হয়েছে প্রবেশ ফি। গড়ে তোলা হয়েছে ক্যাফেটেরিয়া, রেস্তোরাঁ। শুধু তাই নয়, এখানকার বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গাছ অযত্নে অবহেলায় ফেলে রেখে নষ্ট করা হচ্ছে। নতুন নতুন গাছ লাগিয়ে গার্ডেনের ভারসাম্য রক্ষার কোনও চেষ্টাই কর্তৃপক্ষের নেই। তাছাড়া সারা দেশে তথা এশিয়ার মধ্যে সঙ্কর গোলাপ উৎপাদনের অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত এই গার্ডেনের গোলাপ বাগানটির বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত আমাজন নদীর পদ্ম ও নানা ধরনের শালুক সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হতে বসেছে। জলজ-উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা বন্ধ। চারা তৈরির জন্য দু'নম্বর নার্শারি প্রায় তুলে দেওয়া হয়েছে। বন-মহোৎসব, পুষ্প প্রদর্শনী ও বিনামূল্যে চারা বিতরণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। গাছ চেনা ও জানার জন্য হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষানুরাগী ও উৎসাহী মানুষ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বাগানে আসেন। বর্তমানে গাছগুলির কোনও 'নেমপ্লেট' না থাকার ফলে তাঁরা যে অসুবিধায় পড়েন, সে ব্যাপারে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই কর্তৃপক্ষের। বাগানে এমনভাবে নালা তৈরি করা হয়েছে যে, বহু মূল্যবান গাছের শেকড় নষ্ট হয়েছে।

বাগানের কিছু অংশ গোয়েঙ্কাকে লিজ

সৌন্দর্যায়নের নামে ২০০৮-এর নভেম্বরে গোয়েঙ্কাদের সংস্থা সিইএসসি-কে গার্ডেনের কিছুটা অংশ 'লিজ' দেয় কর্তৃপক্ষ। প্রায় শতাধিক দুষ্প্রাপ্য গাছ কেটে ফেলা হয়। সংবাদে প্রকাশ, সিইএসসি কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা ছিল, নিক্কো পার্কের ধাঁচে একটি চিলড্রেন্স পার্ক তৈরি করে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো। এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এলাকার পরিবেশপ্রেমী মানুষ। বি-গার্ডেন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 'ডেইলি ওয়াকার্স অ্যাসোসিয়েশনের' উদ্যোগে তুমুল বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। হাইকোর্টে গ্রিন বেঞ্চে মামলা দায়ের করা হয়। কলকাতা হাইকোর্ট গার্ডেন কর্তৃপক্ষকে শো-কজ নোটিশ পাঠায়, তদন্ত কমিটি গঠন করে। কলকাতা পুলিশ কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে রিপোর্ট দেয়। উপ-অধিকর্তা জি গিরি আদালতে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। মানুষের সোচ্চার প্রতিবাদে উক্ত প্রয়াস থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হন গার্ডেন কর্তৃপক্ষ। দেশীয় কর্পোরেট সংস্থার গ্রাস থেকে আপাতত রক্ষা পায় বি-গার্ডেন।

গাছ কেটে উনুনে রান্না

কিন্তু ২৪ জানুয়ারি ২০১০, প্রীতিভোজের আসরের ঘটনাটির তাৎপর্য ভিন্ন। এতদিন বি-গার্ডেনকে ধ্বংস করা হচ্ছিল কিছুটা গোপনে, নীরবে। কর্তৃপক্ষের মদতে শাসকদলের ঘনিষ্ঠ স্থানীয় মাফিয়া, কন্ট্রাক্টর ও কাঠব্যবসায়ীরা ছিল এর প্রধান হোতা। কিন্তু এ দিনের এই ঘটনাটি ঘটেছে স্থানীয় ও জেলা পুলিশ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের উপস্থিতিতে। আইনরক্ষকদের সামনেই আইন-কানুনকে পদদলিত করা হয়েছে। কিন্তু এলাকার পরিবেশপ্রেমী মানুষ এই অন্যায় নীরবে মেনে নেননি। ২৫ জানুয়ারি সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে গার্ডেনে ছুটে যান 'ডেইলি ওয়াকার্স অ্যাসোসিয়েশনের' সাধারণ সম্পাদক তাপস দাস, কার্যকরী সভাপতি সমরজিৎ মণ্ডল সহ অসংখ্য সাধারণ মানুষ। আসেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত। ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে 'ডেইলি ওয়াকার্স অ্যাসোসিয়েশনের' নেতৃত্বে স্থানীয় মানুষজন বি-গার্ডেন ১নং গেটে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। কর্তৃপক্ষ দাবি না মানলে লাগাতার ধর্না চালানোর সিদ্ধান্ত নেন তাঁরা। অবশেষে আন্দোলনের চাপে ৪ ঘণ্টা পর অন্যতম ডেপুটি ডিরেক্টর শিবকুমার ঘটনাস্থলে এসে বিষয়টি তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির আশ্বাস দিলে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ধর্না তুলে নেওয়া হয়। স্থানীয় মানুষের প্রশ্ন, বি-গার্ডেনের মত সংরক্ষিত এলাকায় কীভাবে সবুজকে ধ্বংস করে প্রীতিভোজের এই বিশাল আয়োজনের অনুমতি দেওয়া হল? টিকিট ছাড়া ভোজে আমন্ত্রিত সহস্রাধিক অতিথি গার্ডেনে প্রবেশ করল কীভাবে? কর্তৃপক্ষের যোগসাজস ছাড়া এটা কি সম্ভব?

প্রতিবাদে সোচ্চার সাধারণ মানুষ

প্রায় ১০ বছর আগে গার্ডেন কর্তৃপক্ষ যখন টিকিট চালু করে সাধারণের প্রবেশাধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছিল, তার বিরুদ্ধে একজোট হয়েছিলেন নিত্যভ্রমণকারী সর্বস্তরের মানুষ, যাঁরা স্বাস্থ্যচর্চার জন্য নিয়মিত গার্ডেনে যান। এঁরাই গড়ে তুলেছিলেন 'বি-গার্ডেন ডেইলি ওয়াকার্স অ্যাসোসিয়েশন'। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে স্বাক্ষর সংগ্রহ, বিক্ষোভ সমাবেশ, কনভেনশন, পদযাত্রা, ডেপুটেশন প্রভৃতি লাগাতার কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাতঃভ্রমণকারীরা অবাধ প্রবেশের অধিকার রক্ষা করেন। শুধু প্রাতঃভ্রমণই নয়, বিভিন্ন মনীষী ও বিপ্লবীদের জন্মজয়ন্তী ও মৃত্যুদিবস পালনের মাধ্যমে গার্ডেনের মধ্যে উন্নত সাংস্কৃতিক বাতাবরণ গড়ে তোলার চেষ্টাও এঁরা চালিয়ে যাচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই ২৪ জানুয়ারি ঐ ঘটনার পর এলাকার পরিবেশপ্রেমী মানুষ 'ডেইলি ওয়াকার্স অ্যাসোসিয়েশনের' নেতৃত্বে পুনরায় সংগঠিত হচ্ছেন। অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড তাপস দাস ও কার্যকরী সভাপতি সমরজিৎ মণ্ডল জানালেন, ইতিমধ্যে ঐ ঘটনায় যুক্ত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সহ ৪ দফা দাবিতে কয়েক হাজার সাক্ষর সংগৃহীত হয়েছে। বহু মানুষের অংশগ্রহণ, সাহায্য ও সমর্থনে পদযাত্রা হয়েছে। আগামী দিনে ব্যাপক মানুষকে নিয়ে বিক্ষোভ ডেপুটেশনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেশি বেশি সংখ্যায় প্রতিবাদে সামিল হচ্ছেন। তাঁরা সমস্বরে দাবি তুলেছেন, ''বি-গার্ডেনকে ধ্বংস করে প্রমোদ উদ্যানে পরিণত করতে দেব না।''

কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা থেকে

তিনের পাতার পর

পুঁজিপতিশ্রেণীর শ্রেণীশাসনের পরিপূরক অর্থে রচিত — পুঁজিপতিশ্রেণীর শাসন, সামাজিক সম্পত্তির ওপর তাদের ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার, তা যে 'ফর্মে'ই হোক্, তাকে রক্ষা করার স্বার্থেই রচিত, যে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থাই হচ্ছে আজকের সমাজের অগ্রগতির সামনে প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ। ফলে এই সমাজে যে ন্যায়নীতি, মূল্যবোধ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণার ওপর ভিত্তি করে ল অ্যান্ড অর্ডার-এর বর্তমান কাঠামোটি প্রতিষ্ঠিত তা আজ পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে তাদের শাসন ও শোষণকে পাকাপোক্ত করার স্বার্থে একটি সুবিধায় পর্যবসিত হয়েছে। কাজেই কোন প্রগতিবাদীই সামাজিক অন্যায়-অবিচারের ওপর ভিত্তি করে বর্তমান সমাজে যে ল অ্যান্ড অর্ডার — তাকে বশংবদের মতো মেনে চলতে পারে না। নিজেকে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ও প্রগতিবাদী বলে জাহির করব, অথচ নতুন ন্যায়নীতিবোধ ও সামাজিক ন্যায়বিচারের ওপর গড়ে ওঠা গণআন্দোলনগুলোকে সমর্থন করতে ভয় পাব, এ চলতে পারে না।

...স্বাধীনতা হয়েছে বলে গণমুক্তির প্রশ্ন নেই, বিপ্লব নেই — এই কথাও ঠিক নয়। বিপ্লব মানে দেশের মধ্যে ঝামেলা ডেকে আনা, উৎপাদন ব্যাহত করা, উৎপাদন নষ্ট করা, দেশের অগ্রগতি ব্যাহত করা — এ যারা বলে তারা মিথ্যেবাদী। কারণ বিপ্লবের অর্থ উৎপাদন ব্যাহত করা নয়। বরঞ্চ উৎপাদনকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল 'রিসেশন' (মন্দা) ও সঙ্কট থেকে মুক্ত করা, বিজ্ঞানকে পুঁজিবাদী মুনাফার লক্ষ্য থেকে মুক্ত করা। পুঁজিপতিদের লোভ, মজুরদের ঠকিয়ে মুনাফা লোটার দরুন যে বাজার সঙ্কট এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট সেই সঙ্কট থেকে উৎপাদিকা শক্তিকে মুক্ত করা, উৎপাদনকে ক্রমাগত বাড়াবার রাস্তা খুলে দেওয়ার জন্যই বিপ্লব। বিপ্লবে সাময়িকভাবে উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় এইজন্য যে, এই বিপ্লবকে সশস্ত্র ও হিংসাত্মক উপায়ে বাধা দেয় বুর্জোয়া রাষ্ট্র বা বুর্জোয়াদের দালালরা। তাই সাময়িক গন্ডগোলে যে উৎপাদন ব্যাহত হয় তার দ্বারা একথা কোনদিক দিয়ে প্রমাণ হয় না যে, বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্দেশ্য উৎপাদনকে ব্যাহত করা। উপরন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্দেশ্য উৎপাদনকে মুক্ত করা। আর যারা বাধা দেয় তারা উৎপাদনের ক্রমাগত অগ্রগতির রাস্তা খুলে দিতে চায় না বলেই বাধা সৃষ্টি করে। আর এই বাধা সৃষ্টি করার ফলেই উৎপাদন আরও ব্যাহত হয়। তাই উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা কোন সংঘবদ্ধ বিপ্লবী আন্দোলনেরই উদ্দেশ্য নয়। বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্দেশ্য উৎপাদিকা শক্তিকে পুঁজিপতিদের লোভ ও মুনাফার চক্কর থেকে মুক্ত করা এবং অবাধ গতিতে উৎপাদন বাড়িয়ে যাবার রাস্তা খুলে দেওয়া।''

'১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা ও গণমুক্তির সমস্যা'
নির্বাচিত রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড

শ্রমিকশ্রেণীকে তার ঐতিহাসিক প্রয়োজনে অবশ্যই জাগতে হবে

সারা ফ্লাউন্ডার্স

(গত ৩০-৩১ ডিসেম্বর '০৯ ঢাকায় বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় কনভেনশনে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সারা ফ্লাউন্ডার্স। সেখানে রাখা তাঁর মূল্যবান বক্তব্যটি এখানে প্রকাশ করা হল।)

এই মহতী অনুষ্ঠানে আপনাদের শরিক হতে পেরে এবং ঢাকা সহ সারা বাংলাদেশ থেকে আগত শ্রদ্ধেয় প্রতিনিধিদের শুভেচ্ছা জানাতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি। এই কনভেনশন একটা বিশাল কর্মযজ্ঞ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্কার্স ওয়ার্ল্ড পার্টি বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের নেতা এবং সদস্যদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করছে।

আমাদের লক্ষ্য একই — বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এবং সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রাম করা। আমরা বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াইকে শক্তিশালী করতে চাই। বর্তমানে পুঁজিবাদী বহুজাতিক কর্পোরেশন সারা বিশ্বে কাজ করছে, এ পরিস্থিতিতে সর্বহারা আন্তর্জাতিকতাবাদ গড়ে তোলার কাজ সবসময়েই জরুরি।

আমরা বিশ্বব্যাপী এক পুঁজিবাদী সংকটের মধ্যে আছি, যা ১৯৩০-এর মহামন্দার চেয়েও বেশি বিপর্যয়কর। এ বিপর্যয় দেখিয়ে দিয়েছে, পুঁজিবাদ মানবিক সংকট সমাধানে ব্যর্থ। গত ১৮ মাস ধরে অর্থনৈতিক সংকটের কারণে পৃথিবীব্যাপী অর্থনীতি ধসে পড়েছে। এই সংকট লক্ষ লক্ষ মানুষকে কেবল পুঁজিবাদী অস্থিরতাই উপহার দিয়েছে। এখন পুঁজিপতিরা বলছে, মন্দা কেটে যাচ্ছে, অর্থনীতির পুনরায় চাঙ্গা হচ্ছে। কিন্তু এমনই চাঙ্গা হচ্ছে যে তাতে কোনও চাকরি হচ্ছে না। আসলে, অবস্থা এখন এক বছর আগের চেয়েও খারাপ।

শাসকশ্রেণী সংকটটি পুরোপুরি শ্রমিক এবং নিপীড়িতদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আগের মহামন্দার সময়ও এমনই করা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রে লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের ঘর চাই, কিন্তু ঘর জুটছে না, সাথে চাকরি এবং তাঁদের ভবিষ্যতও হারাচ্ছে। এমনকী এই অর্থনৈতিক সংকটের আগেও শ্রমিকের মজুরি ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছিল। বিশ্বায়নের কারণে পুঁজি পৃথিবীব্যাপী আরও বিস্তৃত হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের সংখ্যার বিবেচনায় এই সংকট সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী। বিশ্বব্যাপী উৎপাদনের সামাজিকীকরণ এক অসাধারণ উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে। সারা বিশ্বের মানুষ অতি- উৎপাদন সংকটের মুখোমুখি। নতুন এবং বড় ধরনের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের হুমকি চলছেই। এর পাশাপাশি চলছে খাদ্য সংকট।

পুঁজিবাদ এমন একটি ব্যবস্থা, যার লক্ষ্য মানুষের জীবনের বিনিময়ে হলেও সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। পুঁজিবাদের এই অপরাধমূলক উন্মত্ততা আমরা গত কোপেনহেগেন সম্মেলনে স্পষ্টভাবে দেখেছি। কোপেনহেগেনের আন্তর্জাতিক জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন ছিল এক বড় বিশ্ব জমায়েত, যা পূর্বে দেখা যায়নি। এমন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ওই সভা হয়েছিল, যা সবার জন্যই অতি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক এক বিষয়। ১২৮টি দেশের প্রধানসহ ১৯৩টি দেশের ৪৫,০০০-এর বেশি প্রতিনিধি, আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমের সদস্য, আইনজীবী, প্রভাবসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এবং দানবীয় কর্পোরেশন-গুলোর 'বিশেষ স্বার্থবাহী' প্রতিনিধি এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়া পরিবেশ নিয়ে কাজ করে এমন এনজিওগুলোর হাজার হাজার কর্মী সেখানে জড়ো হয়েছিলেন।

বিশ্বমানবতা যেসব আশু এবং গুরুত্বপূর্ণ সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে, পুঁজিবাদ তার সমাধান করতে একেবারেই অক্ষম। এই জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সম্মেলনের মাধ্যমে তা সম্পূর্ণ উন্মোচিত হয়েছে। এই বিশাল জমায়েত ভয়ানকভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কোনও ঐকমত্য, কোনও নির্দেশনা এবং কোনও কার্যকর চুক্তি ওরা করতে পারেনি। এই সংগ্রামের সত্যিকার বিভক্তি রেখা কার্বন নিঃসরণ কমানোর নানা পরিকল্পনা এবং কতকগুলো কারিগরি ভাষার প্যাঁচে বছরের পর বছর চাপা পড়েছিল। কিন্তু সব তর্কের অন্তরালেই শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রভাবে বর্তমান ছিল। কোপেন-হেগেন সম্মেলন নিশ্চিত করেছে যে, পুঁজিবাদ একটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ব্যবস্থা। কর্পোরেটদের টিকে থাকার ভিত্তিই হল সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন এবং এ গ্রহের অবলুপ্তির হুমকি।

আন্তর্জাতিকভাবে সহযোগিতা যে খুবই প্রয়োজন, এ বিষয়ে সবাই একমত। কিন্তু সহযোগিতা ছিল অসম্ভব। বাস্তব অবস্থা হল এই যে, অবিবেচক প্রতিযোগী শক্তিগুলো প্রত্যেকটা সম্ভাব্য সমঝোতা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলছে। বিভিন্ন দেশের নেতারা যাঁরা শক্তিশালী বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর স্বার্থ দেখেন এবং যারা গোটা সমাজকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক বজ্রমুষ্ঠি দিয়ে আটকে রেখেছেন, তাঁরাই ওই সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এটা স্পষ্ট যে, আজকে পরিবেশ রক্ষার সংগ্রাম করতে হলে অবশ্যই এইসব ডাইনোসর কর্পোরেটদের বিরুদ্ধে এবং যে সামাজিক ব্যবস্থা এদের বাঁচিয়ে রেখেছে তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে। এ বিষয়টা আজ বাংলাদেশের মানুষদের জন্য বাঁচা-মরার একটা বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কারণ তাদের জীবন আজ সমুদ্রের উচ্চতা ও ঝড়ের প্রকোপবৃদ্ধি এবং চাষযোগ্য জমি ডুবে যাওয়ার আশঙ্কার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলো এবং সাবেক উপনিবেশগুলোর জনগণ আজ ক্ষতিপূরণ দাবি করছে। তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলা অনুন্নয়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠন, শ্রমশোষণ এবং পরিবেশ ধ্বংসের মতো নির্যাতনের শিকার।

পেন্টাগন পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি জীবাশ্ম-জ্বালানি ব্যবহারকারী সংস্থা। এ ছাড়াও মার্কিন সামরিকবাহিনী দেশের অভ্যন্তরে ৬,০০০-এরও বেশি সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, বিদেশের ১,০০০-এরও বেশি সামরিক ঘাঁটি, তার বিমানবাহী জাহাজ, বিধ্বংসী যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমানগুলো এবং ইরাক-আফগানিস্তানের যুদ্ধ, সামরিক জোট ন্যাটো যে পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ ঘটায় তার হিসাব কিয়োটো চুক্তির মতো সকল আন্তর্জাতিক জলবায়ু সংক্রান্ত চুক্তির বাইরে রাখা হয়েছে। কোপেনহেগেনের জলবায়ু সম্মেলনের আলোচনাতেও তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কাজেই, কার্বন নিঃসরণ কমানোর প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত পেন্টাগনকেই তুলে দেওয়া।

জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র এবং পাশ্চাত্য শক্তি শুধু ক্ষতিপূরণের দাবিই প্রত্যাখ্যান করেনি, তারা এমনকী নিজেদের কার্বন নিঃসরণের উপর কোনওরকম কার্যকর নিয়ন্ত্রণ আরোপেরও বিরোধিতা করেছে। তারা সবচেয়ে গরিব দেশগুলোতে নামেমাত্র টাকাকড়ি দিতে চায়, যার বদলে তারা পাবে অবাধে কার্বন নিঃসরণের অনুমোদন।

জলবায়ু পরিবর্তনের পুঁজিবাদী সমাধানের লক্ষ্য ছিল একটা সম্পূর্ণ নতুন স্টক মার্কেট চালু করা, যেখানে কার্বন নিঃসরণের অনুমোদন শেয়ার ও ডেরিভেটিভের মতো করে কেনা-বেচা হবে। এটা হবে আরেকটি ওয়াল স্ট্রিট মার্কেট — যার বাজার তেল শিল্পের বাজারের চেয়েও বড় হবে। তারা 'ক্যাপ এণ্ড ট্রেড' নামক পরিবেশ বিষয়ক একটা স্কিমের ব্যবসা থেকে কোটি কোটি ডলার কামাই করতে চাইছে। এখন আর্থিক খাত বিষয়ক সমস্ত সংবাদ এই নতুন ফাটকা বুদবুদকে ঘিরেই তৈরি হচ্ছে।

কমরেডস, ওই সম্মেলনকে ঘিরে দুনিয়াব্যাপী হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু ওই সম্মেলনে ল্যাটিন আমেরিকার দু'জন নেতা যে বৈপ্লবিক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন, তার প্রতি আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। তাঁরা ক্ষমতাধরদের মুখের উপর সত্য প্রকাশের জন্য ওই সম্মেলনকে কাজে লাগিয়েছেন।

বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেস ঘোষণা করেছেন, 'পুঁজিবাদের অবসান করা ছাড়া আমরা ভূ-উষ্ণায়ন সমস্যার সমাধান করতে পারব না।' তিনি বলেছেন, 'পুঁজিবাদ মানবতার সবচেয়ে মারাত্মক শত্রু। পুঁজিবাদ, এবং আমার মতে বিবেচনাহীন উন্নয়ন, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন নীতিই পরিবেশ ধ্বংস করছে। এই বিবেচনাহীন শিল্পায়নই হল পুঁজিবাদ।'

'যুক্তরাষ্ট্রের বাজেটে ৬৮৭ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ হয় সামরিক খাতে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যার কবল থেকে জীবন এবং মানব সভ্যতা বাঁচানোর জন্য বরাদ্দ শুধুমাত্র ১০ বিলিয়ন ডলার। এটা লজ্জাজনক।'

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো স্যাভেজ প্রশ্ন তুলেছেন, 'সীমিত পৃথিবী কি অসীম একটা প্রকল্পকে ধারণ করতে পারে? পুঁজিবাদের এই অসীম উন্নয়নের চরিত্র ধ্বংসমূলক। চলুন, আমরা এর মোকাবিলা করি। আমরা আর কতদিন চলমান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং বাজার ব্যবস্থা মেনে নেব? আমরা আর কতদিন চলমান বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন বিপন্নকারী এইচআইভি - এইডসের মতো মহামারীকে মেনে নেব? মানুষ নিজ সন্তানকে খাওয়াতে পারবে না, নিজে খেতে পাবে না — এই ক্ষুধা আমরা আর কতদিন সহ্য করব? লক্ষাধিক শিশু যে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে, এটা আমরা আর কতদিন মেনে নেব? আমরা আর কতদিন লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ হত্যাকারী সশস্ত্র সংঘাত চলতে দেব, যা সংঘটিত হয় ক্ষমতাধর দেশগুলো কর্তৃক অন্য দেশের সম্পদ কেড়ে নেওয়ার জন্য?'

'মাননীয় সভাপতি, কেউ যদি মহান মার্কসের সেই বিখ্যাত উক্তিকে ধার করে বলেন, একটা ভূত কোপেনহেগেনকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তাকে কি ভুল বলা যাবে? এই ভূত একটি ভয়ঙ্কর ভূত। ভূতটি হল পুঁজিবাদ। কেউ এর নাম মুখে আনতে চাইছে না। বাইরের দিকে কান পাতুন, জনগণ চিৎকার করে বলছে, এটা পুঁজিবাদ।'

বন্ধুগণ, ল্যাটিন আমেরিকার উপর দিয়ে আজ এক বিপ্লবী ঝড় বয়ে যাচ্ছে। সেখানে জনগণ সমাজতন্ত্র চায়, তারা নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করেছে। কিন্তু শক্তিশালী বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানসমূহ সবই টিকে আছে, যারা পরিবর্তনের সকল আশাকে নস্যাৎ করার জন্য বদ্ধপরিকর। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি দেবে না। তারা প্রতিক্রিয়ার রক্ষাপ্রাচীর।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হন্ডুরাসের ক্যু'কে ব্যাপকভাবে মদত দিয়েছে। কলম্বিয়া, ভেনিজুয়েলা, বলিভিয়া, ইকুয়েডর সম্প্রতি তাদের দেশ থেকে মার্কিন ঘাঁটি উচ্ছেদ করেছে বলে আমেরিকা তাদের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে। এ ঘাঁটি নিকারাগুয়া, এল সালভাদর, আর্জেন্টিনা ও চিলিতে যে পরিবর্তন চলছে তার প্রতিও হুমকি হয়ে আছে। আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সকল ধরনের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের সাথে আছি।

কমরেডস, আমি এসেছি সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্র যুক্তরাষ্ট্র থেকে। কিন্তু এখন এই সাম্রাজ্য সাঙ্ঘাতিক পতন ও ক্ষয়ের মুখে। এটা এমন একটি ব্যবস্থা, যা আক্ষরিক অর্থেই পচে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমজীবী মানুষকে কিছু দেওয়ার ক্ষমতা এর দিন দিন কমে যাচ্ছে এবং সে পৃথিবীর সর্বত্র কোথায় কম মজুরি দিয়ে কাজ করানো যায় তা খুঁজে বেড়াচ্ছে। এভাবে বারবার মজুরি কমানোর মধ্য দিয়ে এই ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব তীব্রতর হচ্ছে।

এটা ঠিক, ১৯৯০-এর দশকে সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতন, পুঁজিবাদী বিনিয়োগের জন্য চীনের বাজার খুলে দেওয়া — এগুলো সাম্রাজ্যবাদকে পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত হওয়া এবং একটু শ্বাস নেওয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত হলেও নজিরবিহীন একটা সময় দিয়েছে। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা বিশ্বজুড়ে তাদের শোষণের জাল বিস্তারের এবং ব্যাপক সর্বোচ্চ মুনাফা করার ব্যবস্থা করে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রমজীবীদের মজুরি তলানির দিকে নিয়ে যাওয়ার বিষময় প্রতিযোগিতা তারা সূচনা করেছে।

এক সময় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের চাপে দশকের পর দশক পুঁজিবাদীরা কোণঠাসা হয়েছে। কিন্তু, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিপর্যয় পুঁজিবাদী বাজারের বিস্তৃতি ঘটানো এবং তাদের ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের নিরসন করার সম্ভাবনা তাদের মাথা ঘুরিয়ে দেয়, তাদেরকে বর্বর করে তোলে। তারা ঘোষণা করে, 'এই শতাব্দী হল আমেরিকান শতাব্দী', 'পুঁজিবাদের বিজয় হয়েছে', এখানে 'ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটেছে।'

কিন্তু কার্ল মার্কস লিখেছিলেন, 'পুঁজিবাদী উৎপাদনের সত্যিকার বাঁধা পুঁজি নিজেই।' সেনাবাহিনী, কারিগরি উন্নয়ন এবং শ্রমিকবিরোধী আক্রমণ দিয়েও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা এবং কর্পোরেশনগুলোকে রক্ষা করা যায়নি। বিপুল পরিমাণ ঋণ বা ভরতুকি দেওয়ার প্রয়োজন হল। শাসকশ্রেণী ভুয়া পুঁজির বাণিজ্য নির্ভর মুনাফার লোভে ফাটকাবাজি, ক্রেডিট বুদবুদ, বন্ধকি পরিকল্পনা, হরেক রকমের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সব ধরনের জালিয়াতির আশ্রয় নিল। শিল্প-কারখানার লাভের সীমাবদ্ধতা কাটানোর জন্য অসংখ্য কাগুজে লাভের ভেলকিবাজি দেখানো হল। কিন্তু, বর্তমান পুঁজিবাদী পুনরুজ্জীবনের ওই কৃত্রিম শক্তিসমূহও নিঃশেষ হয়ে গেছে; চলমান সংকটে ওই সমস্ত পদ্ধতি ও ব্যবস্থাকে পুনরায় চালু করতে পারার মতো উল্লেখযোগ্য কোনও পথ দেখাতে পারছে না। বিশ্বায়িত উৎপাদন পৃথিবীব্যাপী লে-অফ এবং বেকারত্বের মহামারী নিয়ে এসেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সামরিক অভিযানের মাধ্যমে তাদের হারানো ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান ফিরিয়ে আনতে পুনরায় চেষ্টা করছে। এর জন্য হেন অপরাধ নেই যা ওরা করছে না। ইরাক- আফগানিস্তানের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে এবং এটাকে পাকিস্তান পর্যন্ত টেনে নিয়েছে; ইরান ও কোরিয়াকে হুমকি দিচ্ছে। এরা সাদা ফসফরাস, বাংকার ধ্বংসকারী বোমা, ইউরেনিয়াম ছাই ব্যবহার করবে, অন্য দেশের ওপর ক্ষুধা-অবরোধ চাপিয়ে দেবে, এমনকী নিউক্লিয়ার অস্ত্রও ব্যবহার করবে।

ইরাকের এক তৃতীয়াংশ লোক আজ মৃত,

সাতের পাতায় দেখুন

ডাঃ তরুণ মণ্ডলের সাংসদ তহবিল থেকে এলাকা উন্নয়নে বরাদ্দ অর্থ ও কাজের বিবরণ

প্রত্যেক সাংসদ জনগণের স্বার্থে এলাকা উন্নয়নের কাজে ব্যয় করার জন্য প্রতি বছর ২ কোটি টাকা সাংসদ তহবিল পান। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ডাঃ তরুণ মণ্ডল গত লোকসভা নির্বাচনে জয়নগর কেন্দ্রে জয়ী হওয়ার পর ২০০৯-১০ অর্থবর্ষে ২৫ মার্চ পর্যন্ত গত ৮ মাসে কোন কোন এলাকায় কী ধরনের এবং কত টাকার কাজ করেছেন, তার তালিকা জনগণের অবগতির জন্য সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, এলাকার মানুষের প্রয়োজন বিচার করে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। জনপ্রতিনিধি হিসাবে জনগণের কাছে এটা তাঁর দায়বদ্ধতা। এ না হলে জনপ্রতিনিধি কথাটা অর্থহীন হয়ে পড়ে। আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট মার্কসবাদী চিন্তানায়ক সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ দলের নেতা-কর্মীদের এই শিক্ষার আধারেই গড়ে তুলেছেন। যেমন ১৯৬৯ সালে এ রাজ্যে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পূর্তমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় জননেতা প্রয়াত কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী সড়ক, সেতু প্রভৃতি নির্মাণ কাজের পাশে প্রকাশ্যে বোর্ডে লিখে জানিয়ে দিতেন — কী ধরনের কাজ হবে, কী কী মালপত্র কত পরিমাণে ব্যবহার হবে ইত্যাদি। এর লক্ষ্য ছিল দুটি। এক, সরকারি কাজ জনগণের কাছে খোলাখুলি রাখা; দুই, চুরি, দুর্নীতি, কারচুপি যাতে না হয়, সেদিকে এলাকার জনসাধারণ যাতে নজর রাখতে পারেন। অর্থাৎ জনগণের ট্যাক্সের টাকায় সরকারি কাজে জনগণের সরাসরি তদারকির অধিকারকে মান্যতা দেওয়া।

নিচে তালিকা দেওয়া হল ঃ

কাজ	স্থান	টাকা
ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা (২৪.৮ লক্ষ টাকা)		
ভাঙড় ১ নং ব্লক		
• অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা	শাকশহর, দুর্গাপুর, বোদরা	৬ লক্ষ
• খোরোখালি - বিদ্যাধরী খাল খনন	তাড়দহ	২.৮ লক্ষ
• অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা	চন্দনেশ্বর (১) এবং চন্দনেশ্বর (২)	৪ লক্ষ
খ) ক্যানিং ২ নং ব্লক		
• গভীর নলকূপ ১০টি	মঠের দীঘি-২, কালিকাতলা - ৩, সারেঙ্গাবাদ - ২, দেউলি (১) - ১, দেউলি (২) - ১, তাম্বুলদহ (২) - ১	৮ লক্ষ
• ইটের রাস্তা ১টি	দেউলি (১)	১.৫ লক্ষ
• পাতিখালি নতুনপাড়া প্রাইমারি স্কুলের উন্নয়ন	তাম্বুলদহ (১)	২.৫ লক্ষ
ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা (২৬ লক্ষ টাকা)		
• গভীর নলকূপ ২০টি	ইটখোলা - ৩, গোপালপুর - ৩, হাটপুকুর - ২, নিকারিঘাটা - ২, দিঘীর পাড় - ২, দাঁড়িয়া - ২ , বাঁশড়া - ৩, নারায়ণপুর- ৩,	১৬ লক্ষ
• ইটের রাস্তা ২টি	মাতলা (১) ও মাতলা (২)	৪ লক্ষ
• অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা	তালদি	৬ লক্ষ
জয়নগর বিধানসভা (২৭ লক্ষ টাকা)		
• মাতৃমঙ্গল শিশুমঙ্গল কেন্দ্র ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট	জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা	১২ লক্ষ
• হাসপাতালে বিশ্রামাগার ও শৌচাগার নির্মাণ	পদ্মের হাট ও নিমপীঠ গ্রামীণ হাসপাতাল	৯ লক্ষ
• অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা	মায়াহাউড়ি, ময়দা, রাজাপুর-করাবেগ	৬ লক্ষ
বাসন্তী বিধানসভা (২৮ লক্ষ টাকা)		
• গভীর নলকূপ ২৮টি	১৪টি অঞ্চলে ২টি করে	২৮ লক্ষ
কুলতলী বিধানসভা (২১.৩০ লক্ষ টাকা)		
• গভীর নলকূপ ১৫টি	ভুবনেশ্বরী-গুড়গুড়িয়া, গোপালগঞ্জ, জালাবেড়িয়া (১) ও (২), মৈপীঠ-বৈকুণ্ঠপুর, কুন্দখালি-গোদাবর, মেরীগঞ্জ (২), মণিরতট	১৬.৩ লক্ষ
• ইট সোলিং রাস্তা ২টি	বাইশহাটা, নলগোড়া, জালাবেড়িয়া (২)	৫ লক্ষ
• ইট সোলিং রাস্তা ২টি	বাইশহাটা, নলগোড়া, জালাবেড়িয়া (২)	৫ লক্ষ
গোসাবা বিধানসভা (২৪ লক্ষ টাকা)		
• বিদ্যালয় উন্নয়ন ৭টি	চন্ডীপুর হাইস্কুল, গোপালকাঠা জেলেপাড়া হাইস্কুল, সাতজেলিয়া নটবর বিদ্যালয়, কালিদাসপুর ভীমচন্দ্র বিদ্যালয়, বাগবাগান উত্তরডাঙ্গা ব্রজমহেন্দ্র, বিজয়নগর আদর্শ বিদ্যালয়, দক্ষিণ রাধানগর শ্রী গৌরাঙ্গ হাইস্কুল	১৫ লক্ষ
• ফেরিঘাটে যাত্রী বিশ্রামাগার, বাথরুম ও টয়লেট (২ টি)	গোসাবা ও চন্ডীপুর ফেরিঘাট	৪ লক্ষ
• অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা	গোসাবা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৫ লক্ষ
মগরাহাট পূর্ব বিধানসভা (৩০ লক্ষ টাকা)		
• অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা ২টি	হোটর মর্যাদা, উত্তর ধামুয়া	৬ লক্ষ
• গভীর নলকূপ ২টি	মগরাহাট পূর্ব, ডিহি কলস	২ লক্ষ
• ইটের কংক্রিট রাস্তা ১৭টি	গোকর্ণী, নৈনান, দঃ ধামুয়া, আমড়াতলা মুলটি ২টি, মগরাহাট পশ্চিম, যুগদিয়া ৪টি, মগরাহাট পূর্ব, ধনপোতা, ডিহি কলস, উড়েল চাঁদপুর, মোহনপুর ২টি	২২ লক্ষ
	মোট টাকা	১৮১.১ লক্ষ

প্রকল্প অনুসারে খতিয়ান

	সংখ্যা	টাকা
• গভীর নলকূপ	৭৫ টি	৭০.৩ লক্ষ
• অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা	০৭ টি	৩৩ লক্ষ
• হাসপাতাল উন্নয়ন ও বিশ্রামাগার	০৩ টি	২১ লক্ষ
• ইট সোলিং ও ইটের কংক্রিট রাস্তা	২২ টি	৩২.৫ লক্ষ
• বিদ্যালয় উন্নয়ন	০৮ টি	১৭.৫ লক্ষ
• ফেরিঘাটে যাত্রী বিশ্রামাগার, বাথরুম ও টয়লেট	০২ টি	০৪ লক্ষ
• সেচের খাল খনন	০১ টি	০২.৮ লক্ষ
মোট প্রকল্পের সংখ্যা	১১৮ টি	১৮১.১ লক্ষ

• জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের অধিকাংশ এলাকা তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং সংখ্যালঘু মুসলিম ও ক্রিশ্চান অধিবাসী অধ্যুষিত। এই সমস্ত গ্রামগুলির প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে।

৮০ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে

তিনের পাতার পর

তাহলে এক্ষেত্রে সরকার উৎসাহ দেখায় না কেন? আসলে, গণআন্দোলন, জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলন, ধর্মঘট ইত্যাদির দ্বারা শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণ, অত্যাচার, বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়বে, শক্তিসঞ্চয় করবে; সচেতনভাবেই একদিন পুঁজিবাদকে উৎখাত করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। তাই মালিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষায় সরকারি তৎপরতার ঘাটতি হয় না। অন্যদিকে, ঐ একই শোষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে রাতে না খেয়ে ঘুমাতে যাওয়া ৮০ কোটি জীর্ণশীর্ণ মানুষের প্রতি সরকার চোখ বন্ধ করে থাকে। আবার বন্‌ধ ধর্মঘট হলে গরিব মানুষ কাজ পাবে না, উপোস করবে বলে প্রচারের ঝড় তুলে যারা কাঁদুনি গায়, তারাও বাকি দিনগুলিতে গরিব মানুষের উপোসের কথা ঐ একই কারণে ভুলে যায়। ভোটের দিকে চোখ রেখে কথার মালা সাজিয়ে সরকার ও শোষকপক্ষের বিরোধী দলগুলি শোষিত জনসাধারণকে প্রতারণা করে। পুঁজিবাদ টিকে থাকবে আর দারিদ্র, বৈষম্য ঘুচে যাবে বা কমবে — এমন সোনার পাথরবাটিহয় না। তাই সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন নয়, চাই সঠিক রাস্তায় সঠিক বিপ্লবী নেতৃত্বে সংগঠিত দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলন।

স্টিফেন কোর্ট অগ্নিকাণ্ড ঃ রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে স্টিফেন কোর্টের অগ্নিকাণ্ড নিয়ে রাজ্যপালের কাছে ১ এপ্রিল একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু সহ কমরেডস দেবপ্রসাদ সরকার, তপন রায়চৌধুরী, স্বপন ঘোষ ও চিররঞ্জন চক্রবর্তী। ডেপুটেশনে উদ্ধারকার্যে সরকারি গাফিলতির জন্য তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি করা হয়।

স্মারকলিপিতে বলা হয়, ২৩ মার্চ স্টিফেন হাউসের মর্মান্তিক ঘটনার আগে সম্প্রতি উল্টোডাঙার গরিব জনবসতি আগুনে শেষ হয়েছে। নন্দরাম মার্কেট ও চাঁদনি চকের ঘটনা থেকেও সরকার কিছুমাত্র শিক্ষা নেয়নি। স্টিফেন হাউসের ঘটনার পর সংবাদপত্রে একের পর এক রাজ্যের হেরিটেজ বিল্ডিংগুলির বিপজ্জনক অবস্থার কথা প্রকাশ হয়ে চলেছে। এগুলিতে যে কোনও দিন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে যেতে পারে। রাজ্যে দমকল বিভাগের জন্য আলাদা একজন মন্ত্রী আছেন, কোটি কোটি টাকা সরকারি তহবিল থেকে ব্যয় হচ্ছে, অথচ তৎপরতা বাড়ার বদলে আগে যেটুকু ছিল, তাও শেষ হচ্ছে। বড় বড় বাড়িগুলিতে আগুন প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। অথচ এসব বাড়ির প্ল্যান ও এখানে যে সব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের ফায়ার লাইসেন্স থাকা বাধ্যতামূলক। এ নিয়ে কলকাতা পুরসভা, ফায়ার ব্রিগেড ও সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি চলছে। কোথা থেকে, কীভাবে তারা প্ল্যান ও লাইসেন্স জোগাড় করছে, তা খুঁজে বের করার কোনও উদ্যোগ সরকারের নেই।

স্টিফেন হাউসের ঘটনায় মৃতদের সনাক্ত করার জন্য হাসপাতালে গেলে শোকসন্তপ্ত পরিবারের লোকদের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ঘটনার মূলে যে প্রশাসনিক অবহেলা ও দুর্নীতি, তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। মৃতদের সনাক্ত করার জন্য ডি এন এ পরীক্ষা বা রক্তপরীক্ষার ব্যবস্থাতেও যে চরম অব্যবস্থা চলছে, তা কোনও সভ্য দেশে ভাবা যায় না। আগুন লাগার পর সুউচ্চ মই আনতে দেড় ঘণ্টা কেটে গিয়েছে, কারণ সেগুলিকে রাখা হয়েছে কলকাতা শহরের বাইরে। অগ্নিভয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়া মানুষকে বাঁচাবার মতো জাল বা কুশন দমকলের আছে কি না, থাকলে কোথায় আছে, কেন তা আনা হয়নি তার জবাব দেওয়ার দায়িত্বটুকু পর্যন্ত প্রশাসনের নেই।

এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ও মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য যাদের জবাবদিহি করার কথা তাদের উপর দেওয়া হয়েছে তদন্তের ভার, ফলে সত্য যে উদ্‌ঘাটিত হবে না, তা বলাই বাহুল্য। এই অবস্থার প্রতিকার করে নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ করার জন্য উদ্যোগী হতে রাজ্যপালের কাছে আবেদন জানান নেতৃবৃন্দ।

রাজ্যে রাজ্যে কমরেড নীহার মুখার্জী স্মরণসভা

হরিয়ানা

দলের হরিয়ানা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে রোহটকের ছুটরাম পার্ক হলে ১৪ মার্চ কমরেড নীহার মুখার্জী স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড রামফল কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠ করেন। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অনুপ সিং। সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড সত্যবান কমরেড নীহার মুখার্জীর মহান কমিউনিস্ট চরিত্রের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করেন যা সকলের কাছে অনুসরণীয়। কমরেড নীহার মুখার্জী সারা জীবনব্যাপী কীভাবে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিভিন্ন ধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং দলের মধ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষের অদ্বিতীয় উত্তরসূরী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন — প্রধান বক্তা পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে তা উল্লেখ করেন।

ওড়িশা

ওড়িশার কটক শহরের শহিদ ভবনে ১৮ মার্চ প্রয়াত নেতা মহান বিপ্লবী কমরেড নীহার মুখার্জী স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড ধূর্জটি দাস। রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বীণাপাণি দাস কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠ করে শোনান। প্রধান বক্তা পলিটব্যুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, কমরেড নীহার মুখার্জী ১৯৭৬ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষের জীবনাবসানের পর থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৪ বছর দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আমরা দেখেছি, তিনি কী গভীর নিষ্ঠার সাথে এই দায়িত্ব পালন করেছেন এবং কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার যথার্থ উত্তরসূরি হিসাবে তা বহন করেছেন এবং দলের বৈপ্লবিক নেতৃত্ব ও চিন্তার বিস্তারে অনন্যসাধারণ ভূমিকা নিয়েছেন।

ত্রিপুরা

মহান বিপ্লবী কমরেড নীহার মুখার্জীর সুদীর্ঘ সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ত্রিপুরা রাজ্য সংগঠনী কমিটির উদ্যোগে ১৭ মার্চ আগরতলার দশরথ দেব হলে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে কমরেড নীহার মুখার্জীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সৌমেন বসু, রাজ্য সংগঠনী কমিটির ইনচার্জ কমরেড অরুণ ভৌমিক এবং বিভিন্ন জেলার সাংগঠনিক কমিটি, এমএসএস, ডিএসও-র রাজ্য কমিটি, সিপিআই-এর কমরেড দীনেশ চন্দ্র সাহা প্রমুখ। কমসোমলের গার্ড অব অনার প্রদর্শনের পর কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠ করেন সভার সভাপতি কমরেড অরুণ ভৌমিক। প্রধান বক্তা কমরেড সৌমেন বসু কমরেড নীহার মুখার্জীর বিপ্লবী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষের মৃত্যুর পর কমরেড নীহার মুখার্জী শুধু দলের সাধারণ সম্পাদকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমাদের সকলের সবচেয়ে বড় অভিভাবক। তিনি বলেন, কমরেড শিবদাস ঘোষ এই দেশের মাটিতে একটি প্রকৃত সাম্যবাদী দল গড়ে তোলার ঐতিহাসিক সংগ্রামের সূচনা করেন। কমরেড নীহার মুখার্জী এই সংগ্রামে কমরেড শিবদাস ঘোষের ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধা হিসাবে সামিল হন। তাই কমরেড নীহার মুখার্জীকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দল ও কমরেড শিবদাস ঘোষ থেকে আলাদা করে ভাবা যায় না।

তাঁর নেতৃত্বে দল ভারতের প্রতিটি রাজ্যে শুধু বিস্তার লাভ করেছে তাই নয়, রাজ্যে রাজ্যে গণআন্দোলনও একটা সুসংহত রূপ নিয়েছে। কমরেড বসু বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পতনের পর সারা বিশ্বে যে প্রবল সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিপদ দেখা দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে দেশে দেশে লড়াই গড়ে তোলার জন্য বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি ও সাম্যবাদী দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে কমরেড শিবদাস ঘোষের বিপ্লবী চিন্তার ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াই গড়ে তোলার উদ্যোগ আমাদের দল গ্রহণ করে কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে। তিনি বলেন, আজ চূড়ান্ত অবক্ষয়িত ব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যৌথ কর্মপদ্ধতি, যৌথ জীবনযাপন, যৌথ চিন্তা চর্চার মাধ্যমে এস

১৪ মার্চ পাঞ্জাবের স্মরণসভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রতাপ সামল, পাশে কমরেড অমিন্দর পাল সিং

ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমেই কমরেড নীহার মুখার্জীর বৈপ্লবিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়। সভায় বুদ্ধিজীবী সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

কর্নাটক

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কর্ণাটক রাজ্য কমিটি ২১ মার্চ প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী স্মরণে এক সভার আয়োজন করে। মালেশ্বরমের সেবাসদনে অনুষ্ঠিত এই সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদক কমরেড কে রাধাকৃষ্ণ বলেন, কমরেড নীহার মুখার্জী অসুস্থতার কারণে শারীরিকভাবে গৃহে আবদ্ধ হয়ে গেলেও দলের বিস্তৃতি, দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের আয়োজনের যাবতীয় কাজই তিনি পরিচালনা করেছেন। মৃত্যুকে একজন বিপ্লবী কীভাবে মোকাবিলা করে কমরেড নীহার মুখার্জীর জীবন তার উজ্জ্বল নজির।

পাঞ্জাব

১৪ মার্চ পাঞ্জাবের বুধলাদার রামলীলা গ্রাউন্ড হলে মহান বিপ্লবী নেতা কমরেড নীহার মুখার্জী স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। মানসা, পাতিয়ালা, মোহালি, চন্ডীগড় প্রভৃতি জেলা থেকে নেতা-কর্মী-সমর্থকরা এই সভায় প্রিয় নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে সমবেত হন। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য ইনচার্জ কমরেড অমিন্দর পাল সিং সভায় সভাপতিত্ব করেন। প্রধান বক্তা ছিলেন দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল। প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন দলের অন্যতম নেতা কমরেড ইন্দ্রজিৎ সিং, এ আই ইউ টি ইউ সির পক্ষে কমরেড থানা সিং, এ আই এম এস এস-এর পক্ষে কমরেড যশবীর কাউর, এ আই ডি এস ও-র পক্ষে কমরেড কুলবিন্দর এবং কমরেড ইন্দ্রজিৎ যোধা। কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠ করেন কমরেড ইন্দ্রজিৎ সিং।

শ্রমিকশ্রেণীকে অবশ্যই জাগতে হবে

পাঁচের পাতার পর

পঙ্গু অথবা পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে শরণার্থী হিসেবে অবস্থান করছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পুনরায় ইরাককে খণ্ড-বিখণ্ড করছে। এটা সমস্ত মানবতার বিরুদ্ধে একটা মহা অপরাধ। তবুও এরা ইরাকি জনগণের প্রতিরোধ ধ্বংস করতে পারেনি।

আপনারা জানেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাই অস্ত্রের পিছনে বিশ্বের অন্য সব দেশের মোট ব্যয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করে। অতীতে এই বিশাল বরাদ্দের মাধ্যমে বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোকে অর্থনৈতিক মন্দা থেকে রক্ষা করা সম্ভব হত। এরা অস্ত্র তৈরির জন্য কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করত। কারণ এ খাত থেকেই আসত মুনাফার সেরা হার। কোনওরকম অর্থ এরা স্কুল, হাসপাতাল অথবা গৃহনির্মাণের জন্য বিনিয়োগ করতে ইচ্ছুক ছিল না। কিন্তু, সামরিক ব্যয় আজ আর পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে পুনরায় চালু করতে এবং এর উন্নতি ঘটাতে পারছে না। পুঁজিবাদ একটা দীর্ঘমেয়াদী এবং গভীরতর সংকটের কালে প্রবেশ করেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সামরিক শক্তি আছে। কিন্তু এই বাহিনী ইরাকে এবং আফগানিস্তানে প্রতিরোধ দমনে অক্ষম হয়ে পড়ছে। এরা জয়ী হতে পারছে না। এরা লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করছে। কিন্তু এই অর্থের পুরোটাই যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্পোরেশনগুলোর পকেটে, হাজার হাজার প্রাইভেট ঠিকাদার, ভাড়াটে এবং দুর্নীতিবাজ যুদ্ধবাজদের পেটে। এরা জনজীবনের মান উন্নয়নে, নিরাপত্তা দিতে, স্বাস্থ্যসম্মত নিকাশি ব্যবস্থা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে অক্ষম। এরা শুধু দমন-পীড়ন এবং ধ্বংস করতে পারে।

বোন ও ভাইয়েরা, শেষ করার আগে আমি বলতে চাই, এই সপ্তাহে গাজায় প্যালেস্টাইনি জনগণের উপর ইজরায়েলি বোমা বর্ষণের এক বছর পূর্তি হল। প্রত্যেকটা ট্যাঙ্ক, ক্ষেপণাস্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জোগান দিয়েছিল। প্যালেস্টাইনি জনগণের দৃঢ় প্রতিরোধ দশকের পর দশক ধরে কষ্টকর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের এ সংগ্রাম সারা দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছে। এ অবস্থায় জনগণের সংহতিকে অবশ্যই একটা কার্যকর শক্তিতে পরিণত করতে হবে।

আপনারা হয়তো জানেন, শত শত ট্রাকে করে ত্রাণসামগ্রী গাজার পথে আসে। ব্রিটেন, স্পেন, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশান সেন্টারের কমরেডগণ, তুর্কি, সিরিয়া, মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত কর্মীরা নিজেরাই এগুলো চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আজ ওই ত্রাণসামগ্রী জর্ডানের একুয়াবা বন্দরে আছে। তারা সবাই উপবাসে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রাণ মিশরের ভিতর দিয়ে গাজায় নিয়ে যাওয়ার অনুমোদন না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের এ উপবাস চলবে।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের এই কনভেনশন একটা ক্রান্তিলগ্নে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সারা বিশ্বে শত শত মানুষ গত দশকের তুলনায় আরও পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছে যে, পুঁজিবাদে কোনও সমাধান নেই। টিকে থাকার জন্য আমাদের সমাজতন্ত্র প্রয়োজন। তবে, সমাজতন্ত্র এমনি এমনিই হবে না। দুর্ভাগ্যবশত, শুধু ব্যর্থতার কারণেই পুঁজিবাদের বিপর্যয় ঘটবে না, কিংবা এর চেয়ে বেশি মানবতাবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে না। অর্থনৈতিক সংকট আপনাআপনি পুঁজিবাদকে নিঃশেষ করতে পারবে না, কোনও বিপ্লবের জন্ম দিতে পারবে না। এর জন্য প্রয়োজন বিশ্বজুড়ে শ্রমিক, কৃষক এবং সমস্ত শ্রমজীবীশ্রেণীর সংগঠিত ও পরিকল্পিত কাজ। এই সংগঠন গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন দৃঢ়সংকল্প বিপ্লবী পার্টি, সংগ্রামের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, শৃঙ্খলায় ও উৎসর্গে আপসহীন কর্মীবাহিনী এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ যা বিজয় অভিমুখে সঠিক রণনীতি ও কৌশল জোগাবে।

কমরেডগণ, বোন এবং ভাইয়েরা, এটাই বাংলাদেশে আপনাদের অস্তিত্বের গুরুত্ব। আপনাদের কনভেনশন এবং এখানে হাজার হাজার দৃঢ়চেতা যোদ্ধার উপস্থিতির গুরুত্বও এই জায়গায়। সঠিকভাবে আশু ভবিষ্যৎ জানা যায় না। তবে এটা জানা যায় যে শ্রমিক শ্রেণীর সত্যিকারের নেতৃত্বকে তার ঐতিহাসিক প্রয়োজনে অবশ্যই জাগতে হবে। পুঁজিবাদ মানবতার যে সংকট তৈরি করেছে তার সমাধান করতে হবে এবং একটি সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে।

পৃথিবীকে সাম্রাজ্যবাদের এই শোষণমূলক ও ধ্বংসাত্মক ব্যবস্থা থেকে মুক্ত করার জন্য সকল শক্তির আন্তর্জাতিক সংহতি আরও বেশি মাত্রায় প্রয়োজন হবে। আসুন, বাংলাদেশ ও আমেরিকায় যে দুটো পার্টি একই লক্ষ্যে কাজ করছে তাদের সংহতি দৃঢ় করি।

গরম ও পরীক্ষার মধ্যে লোডশেডিং, কলকাতায় রাস্তা অবরোধ

কলকাতা সহ সারা পশ্চিমবাংলায় প্রতিদিন ৫-৬ ঘণ্টারও বেশি লোডশেডিং চলছে। মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীরা লোডশেডিং-এ অতিষ্ঠ। মার্চ মাসেই ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় জনজীবন যখন বিপর্যস্ত, তখন সরকারি মন্ত্রী-আমলারা 'কয়লার সরবরাহ কম তাই বিদ্যুৎ উৎপাদন কম'— এই ভাঙা রেকর্ড শুনিয়েই যাচ্ছেন। এর প্রতিবাদে ২০ মার্চ কয়েক শত বিদ্যুৎগ্রাহক কলেজ স্ট্রিট-মহাত্মা গান্ধী রোড ক্রসিং অবরোধ করেন। বিদ্যুৎমন্ত্রীর কুশপুতুল পোড়ানো হয়।

অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক অনুকূল ভদ্র বলেন, লোডশেডিং কমানোর জন্য বিদ্যুতের ব্যাপক দামবৃদ্ধি হল। বলা হল, বেশি দামে কয়লা কিনে উৎপাদন বাড়ানো হবে, বাইরে থেকেও বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনে পশ্চিমবাংলার মানুষকে বিদ্যুৎ সরবরাহ অব্যাহত রাখা হবে, তার জন্য গ্রাহককে অনেক বেশি দাম দিতে হবে। গ্রাহকদের মতামত না নিয়েই একতরফাভাবে নজিরবিহীন দাম বাড়ানো হল। তাও এক বছরে দু'বার। কিন্তু লোডশেডিং কমার কোনও ইঙ্গিত নেই। আবার আর এক প্রস্থ দাম বাড়ানোর ইঙ্গিত সরকার দিয়েই রেখেছে। তিনি বলেন, কোনও সভ্য সমাজ এটা মেনে নিতে পারে না। এর বিরুদ্ধে তিনি গ্রাহকদের আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

R.N.I. No 5268 / 60
Postal Registration No. KOL / RMS / 138 / 2010-12

গ্রামের মানুষের প্রাণ কি মূল্যহীন, সংক্ষিপ্ত ডাক্তারি বিদ্যায় তাঁদের চিকিৎসা হবে কেন?

সম্প্রতি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গ্রামের মানুষের চিকিৎসার জন্য সাড়ে তিন বছরের সংক্ষিপ্ত ডাক্তারি কোর্স প্রবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দুই সরকারেরই বক্তব্য, এমবিবিএস পাশ করা ডাক্তাররা চিকিৎসার জন্য গ্রামে যেতে চান না, সেই কারণে গ্রামের মানুষের চিকিৎসা খুবই অবহেলিত। এই অসুবিধা দূর করার জন্যই নাকি সংক্ষিপ্ত এই ডাক্তারি কোর্সের প্রবর্তন। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার এবং হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি। ২১ মার্চ কলকাতায় স্টুডেন্টস হলে আয়োজিত এক কর্মশালায় উক্ত দুই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধে জনসাধারণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

তাঁদের আপত্তির প্রধান কারণ, সংক্ষিপ্ত ডাক্তারি বিদ্যায় গ্রামের মানুষের চিকিৎসা হবে কেন, তাঁদের প্রাণের কি দাম নেই? গ্রামের মানুষের অ্যানাটমি, ফিজিওলজি কি শহরের মানুষের থেকে যেতে চান না — কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এই বক্তব্যও মিথ্যায় ভরা। পশ্চিমবঙ্গে গ্রামে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ৯২৪টি মেডিকেল অফিসার পোস্টের মধ্যে ৮১০ জন কাজ করছেন। অর্থাৎ ৮৮ শতাংশ পোস্টে মেডিকেল অফিসার কাজ করছেন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গ্রামে এই পোস্টে ৯৩ শতাংশ অফিসার কাজ করছেন। ফলে ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চান না — তথ্যের দিক থেকে এ কথা সত্য নয়। সরকার যদি গ্রামাঞ্চলে ডাক্তার পাঠাতে সত্যিই আগ্রহী হয়, তা হলে দীর্ঘদিন পিএসসি-র মাধ্যমে ডাক্তার নিয়োগ বন্ধ রেখেছে কেন? গ্রামে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে সরকার যত সংখ্যক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ার কথা বলেছিল এবং তাতে যতজন চিকিৎসক ও চিকিৎসা সহায়ক দেওয়ার কথা ছিল, আজ পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার ৫০ শতাংশও পূরণ করেনি। তাছাড়া গ্রামে শুধু ডাক্তার গেলেই তো চিকিৎসা হবে না, একই সঙ্গে পাঠাতে হবে পর্যাপ্ত ওষুধ, চিকিৎসার নানা

২১ মার্চ স্টুডেন্টস হলে বক্তব্য রাখছেন ডাঃ সুভাষ দাশগুপ্ত। উপবিষ্ট (বাঁদিক থেকে) ডাঃ বিশ্বনাথ পাড়িয়া, ডাঃ অশোক সামন্ত, সদানন্দ বাগল, ডাঃ তরুণ মণ্ডল ও ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি।

আলাদা? গ্রামের মানুষদেরও শহরের মানুষের মতোই হার্ট অ্যাটাক, মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ, হাই ব্লাডসুগার, থাইরয়েড সমস্যা থেকে শুরু করে যক্ষ্মার মতো নানা কঠিন রোগও হয়। এই সমস্ত রোগের চিকিৎসার জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রে যে সামগ্রিক জ্ঞান থাকা দরকার তার জন্য পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে অধ্যয়ন করতে হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারায় প্যাথোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ফার্মাকোলজি, সার্জারি, গায়নোকোলজি, অবস্টেট্রিক্স, মেডিকেল জুরিসপ্রুডেন্স, হাইজিন, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, ইন্টারনাল মেডিসিন, অপথ্যালমোলজি, সাইকিয়াট্রি, ডারম্যাটোলজি, কার্ডিওলজি, নিউরোলজি, পালমোলজি, জেনেটিক্স, ইমিউনোলজি, অ্যানাস্থেসিওলজি, এমনকী রেডিও ডায়াগনোসিসের মতো বিষয় মেডিকেল কোর্সের অন্তর্ভুক্ত। এই বিষয়গুলিতে সম্যক জ্ঞান অর্জিত না হলে ডাক্তার হওয়া যায় না। আর পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করতে হলে কমপক্ষে ৬ বছর সময় দরকার। সেই কারণে 'ভোর কমিটি'র সুপারিশ মেনে ৬ বছরের বেসিক ডাক্তারি কোর্স এমবিবিএস চালু হয়েছিল। এখন এই কোর্সের সময়সীমা তিন বা সাড়ে তিন বছর করে দিলে স্বাভাবিকভাবেই খণ্ডিত এবং অসম্পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে যে নব্য ডাক্তার তৈরি হবে তাদের হাতে গ্রামীণ মানুষের জীবন কি নিরাপদ হবে? নাকি এর মধ্য দিয়ে গ্রামীণ মানুষের মৃত্যুর রাস্তাই তৈরি হবে?

দ্বিতীয়ত, এমবিবিএস পাশ ডাক্তাররা গ্রামে উপকরণ। অর্থাৎ গড়ে তুলতে হবে পূর্ণাঙ্গ পরিকাঠামো। সেখানে সরকারের কোনও তৎপরতা নেই কেন?

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ২০০২ অনুযায়ী সরকার স্বাস্থ্যব্যবস্থার বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ পলিসি নিয়েছে। সাড়ে তিন বছরের এই নতুন ডাক্তারি কোর্স এই পলিসি থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। এই নীতিরই ধারাবাহিকতায় জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন (এনআরএইচএম)-এর মাধ্যমে সমান্তরাল স্বাস্থ্য প্রশাসন তৈরি করে বিভিন্ন অসরকারি সংস্থার (এনজিও) মাধ্যমে পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে এই কোর্স চালু করা হচ্ছে। সরকার 'ন্যাশনাল হেলথ বিল ২০০৯'-এর মধ্য দিয়ে এমসিআই, ডিসিআই, ইউজিসি, নার্সিং কাউন্সিল, হোমিও কাউন্সিল প্রভৃতি স্বশাসিত সংস্থাগুলিকে লুপ্ত করে দিতে চাইছে। এর উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যব্যবস্থার চূড়ান্ত বেসরকারিকরণ করা। এই নীতির ফলে সাধারণ মানুষ শেষ পর্যন্ত চিকিৎসার সুযোগ থেকেই বঞ্চিত হবে। নেতৃবৃন্দ এর বিরুদ্ধে জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ডাঃ বিশ্বনাথ পাড়িয়া। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির যুগ্মসম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস, সর্বভারতীয় সম্পাদক সাংসদ ডাঃ তরুণ মণ্ডল, হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির পক্ষে ডাঃ অশোক সামন্ত এবং সদানন্দ বাগল।

বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের রজত জয়ন্তী সমাবেশে যোগ দিল এ আই ডি এস ও

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের রজত জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ৩০ মার্চ ঢাকায় প্রায় ১৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর সুবিশাল ছাত্র সমাবেশ হয়। সমাবেশে ভারতের ছাত্র সংগঠন অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (এ আই ডি এস ও)-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ মুখার্জী, নেপালের মাওবাদী ছাত্র সংগঠন অল নেপাল ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (রেভলিউশনারি)-র সভাপতি কমরেড লেখনাথ নিউপেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছাত্র-যুব সংগঠন 'ফাইট ইম্পিরিয়ালিজম-স্ট্যান্ড টুগেদার' (এফ আই এস টি)-এর ন্যাশনাল অর্গানাইজার কমরেড ল্যারি ডারনেল হেইলস জুনিয়র উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাসভায় বক্তারা বলেন, বুর্জোয়া দলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতায় ছাত্র রাজনীতির অসুস্থ নীতিহীন ধারা, তাদের সন্ত্রাস, তোলাবাজি, দখলদারিত্ব, ভর্তি ও সিটবাণিজ্য সাধারণ মানুষের মনে এবং ছাত্রসমাজের মধ্যে যে হতাশা ও নৈরাজ্যের জন্ম দিয়েছে তার গতি রোধ করে দিয়েছে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট। এই সমাবেশ তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বিকেল সাড়ে ৪টায় ঢাকায় টিএসসি সড়ক মোহনায় নির্মিত বিরাট সুদৃশ্য মঞ্চে রজত জয়ন্তী উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক কমরেড জহিরুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল — বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সৈনিক প্রবীণ বিপ্লবী বিনোদবিহারী চৌধুরী, তেল-গ্যাস খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক শেখ মোঃ শহীদুল্লাহ এবং বিদেশ থেকে আগত ভ্রাতৃপ্রতিম দলগুলির প্রতিনিধিবৃন্দ।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোর মদতে এবং প্রচারমাধ্যমের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের মানুষের মনে এমন একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে, ছাত্র রাজনীতি মানেই নীতিহীনতা, সন্ত্রাস, টেন্ডারবাজি, তোলাবাজি, ভর্তিবাণিজ্য, সিটবাণিজ্য, হতাশা, মাদকাসক্তি। অথচ এর বিপরীতে গত ২৬ বছর ধরে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট তিল তিল করে আদর্শবাদী বিপ্লববাদী ধারার বিকাশ ঘটিয়ে চলেছে। প্রচারমাধ্যমে এ চিত্রটি আড়াল করে রাখা হয়, আর প্রচার করা হয় ছাত্ররাজনীতির ঐতিহ্যের গায়ে কালিমা লেপনকারীদের চেহারা। আজকের হাজার হাজার ছাত্রের দৃপ্ত উপস্থিতি প্রমাণ করেছে ছাত্ররাজনীতির সত্যিকার ধারক কারা। আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, দেশের সত্যিকার আশা-ভরসা-ভবিষ্যৎ নির্মিত হচ্ছে এখানে।

বিপ্লবী বিনোদবিহারী চৌধুরী বলেন, আজ থেকে ৮০ বছর আগে আমি যখন তরুণ ছিলাম তখন মাস্টারদা সূর্য সেনের আহ্বানে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। সেদিন ভারতবর্ষের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে আমাদের মতো হাজার হাজার তরুণ যুবক স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এরপর ব্রিটিশ চলে গেল, পাকিস্তানিরাও চলে গেছে। কিন্তু স্বাধীন দেশের চেহারা দেখে, ছাত্র-যুব সমাজের চেহারা দেখে মনে প্রশ্ন জাগত — এ কি সেই বাংলাদেশ যার জন্য আমরা লড়াই করেছিলাম? এই কি সেই ছাত্রসমাজ যারা একদিন দেশের জন্য প্রাণ দিতে দ্বিধা করেনি? সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের গত ২৫ বছরের আন্দোলন সংগ্রাম, এ সংগঠনের আদর্শবাদী নীতিবান ত্যাগী ছাত্রছাত্রীদের দেখে আমি এ ভরসা পাই, দেশটা ভেসে যায়নি। এখনও দেশের ছাত্রসমাজ পচে যায়নি, নষ্ট হয়ে যায়নি।

এআইডিএসও-র কেন্দ্রীয় সহসভাপতি কমরেড গোবিন্দ রাজালু, কেন্দ্রীয় সহসভাপতি সুব্রত গৌড়ী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড কমল সাঁই, এ এন এন আই এস ইউ (আর)-এর আন্তর্জাতিক বিভাগের সদস্য কমরেড গোপাল কৃষ্ণ নিউপেন তাঁদের বক্তব্যে নিজ নিজ দেশের ছাত্র সমস্যা, ছাত্র আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি তুলে ধরেন। অতিথিদের হাতে স্মারক তুলে দেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক কমরেড জনার্দন দত্ত নান্টু। এআইডিএসও-র পক্ষ থেকেও শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হয়।

৩১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি অডিটোরিয়ামে আন্তর্জাতিক ছাত্রনেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে 'দেশে দেশে শিক্ষা সংকট ও ছাত্র আন্দোলন' শীর্ষক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের কালি শুকানোর আগেই ডেল্টা জুটমিলে লকআউট

শ্রমিক বিক্ষোভ, ধর্মঘটের জন্য যে লকআউট হয় না, ডেল্টা জুট মিল কর্তৃপক্ষ হঠাৎ একতরফা লকআউট ঘোষণা করে আর একবার তা প্রমাণ করল। এ প্রসঙ্গে বেঙ্গল জুট মিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক এবং অল ইন্ডিয়া ইউ টি ইউ সি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য ১ এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলেন, চটশিল্পে অনির্দিষ্টকালের শ্রমিক ধর্মঘট ৬১ দিনের মাথায় ভেঙে দেওয়ার জন্য শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে আমাদের ইউনিয়নের স্বাক্ষর না করার সিদ্ধান্ত যে কত সঠিক ছিল, সাঁকরাইলের ডেল্টা জুট মিল কর্তৃপক্ষের বেপরোয়া ও বেআইনি লকআউটের ঘোষণাই সেটা প্রমাণ করল। তিনি আরও বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চূড়ান্ত উদাসীনতার ফলে প্রায় ৪ হাজার শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে অনাহারের মুখে ফেলে দিতে পারল মিল মালিক। তিনি এর বিরুদ্ধে মিলের সব শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। সাথে সাথে হাওড়া জেলার সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারীদের কাছে এই আন্দোলনে সহযোগিতার আবেদন করেন এবং অবিলম্বে নিঃশর্তে মিলটি খোলা ও মালিকের বেআইনি লকআউটের বিরুদ্ধে আইনানুগ কড়া ব্যবস্থা নিতে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

পাশফেল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে শিক্ষা কনভেনশন

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে ২১ মার্চ মন্দিরবাজার ব্লকের বিজয়গঞ্জ বাজারে এক শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ শশধর পুরকাইত, বিশুদ্ধানন্দ পুরকাইত, প্রধান শিক্ষক শ্যামলকান্তি হালদার, আইনজীবী কার্তিক পাল ও শিক্ষক নেতা অসিত দত্ত, কনক হালদার সহ বহু ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন এ আই ডি এস ও'র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দীনেশ মহন্ত এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড রামকুমার মণ্ডল। ডঃ শশধর পুরকাইতকে সভাপতি এবং সমর কয়াল ও অরবিন্দ প্রামাণিককে যুগ্ম সম্পাদক করে ৩২ জনের শিক্ষার স্বাধিকার রক্ষা উন্নয়ন মঞ্চ গঠিত হয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই (সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in